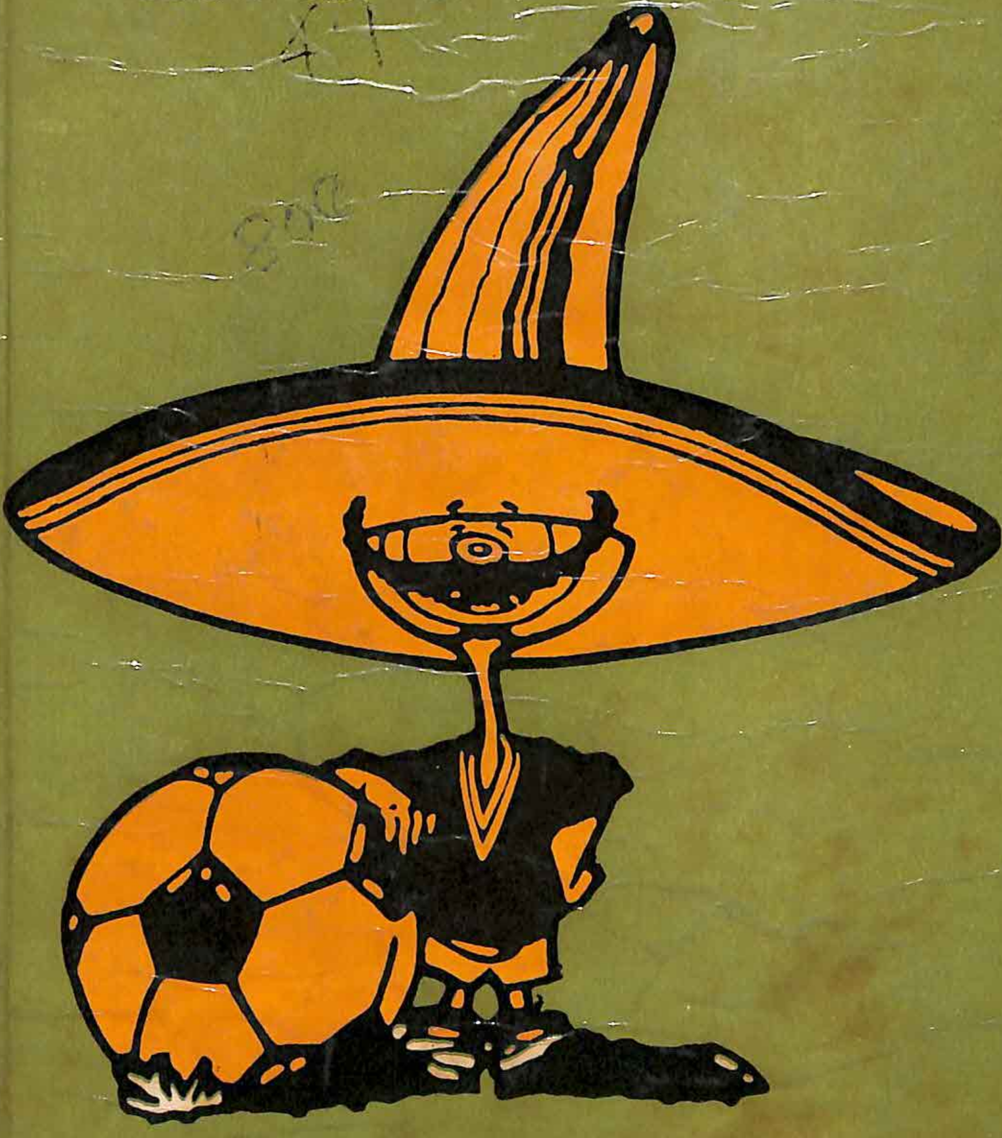
ছোটদের
বিশ্বকাপ ফুটবল



জয়ন্ত দত্ত

ছোটদের

বিশ্বকাপ ফুটবল

জয়ন্ত দত্ত

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

CHHOTODER VISVA-CUP FOOTBALL
(A Descriptive explanation of World Cup Football played from 1930 to 1986 alongwith all records.)

By : Jayanta Dutta

Published by : Anima Prakashani
141 Keshabchandra Sen Street
Calcutta-700 009.

On : July, 1986.

Price : Rs. 16·00

প্রকাশ কাল : শ্রাবণ, ১৩৯৩

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : শ্রীবিদ্যা অশোক

মুদ্রাকর : শ্রীমতী মমতা ঘোষ, প্রিন্টার্স-কর্নার
৪৫/এ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য : ষোলো টাকা

পরম স্নেহভাজনেষু

সুস্মিতা দত্ত-কে

লেখকের অন্যান্য বই :

ছোটদের ক্রিকেটার গ্রেস

খেলার আইন

খেলাধূলার হাজার জিজ্ঞাসা

ফুটবলের যাদুকর স্ট্যানলী ম্যাথিয়ুজ

সানি গাভাসকার

ভিক্টোরিয়াস মোহনবাগান

গ্লোরিয়াস ইষ্টবেঙ্গল

দুরন্ত ক্রিকেটার কপিলদেব

বিশ্ব ক্রিকেটের প্রবাদ পুরুষ

পেলের ডায়েরী



সত্তর সালের বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দল



বিরাশির বিশ্বচ্যাম্পিয়ান
ইতালি দলের অধিনায়ক
দিনোজফ



চমৎকার একটি মুভ তৈরী করছেন ফ্রান্সের তিগানা।



আর্জেন্টিনার অপ্রতিরোধ্য ভালদোনা আক্রমণ তৈরী করছেন।



বল পায়ে ব্রাজিলের জুনিয়ার



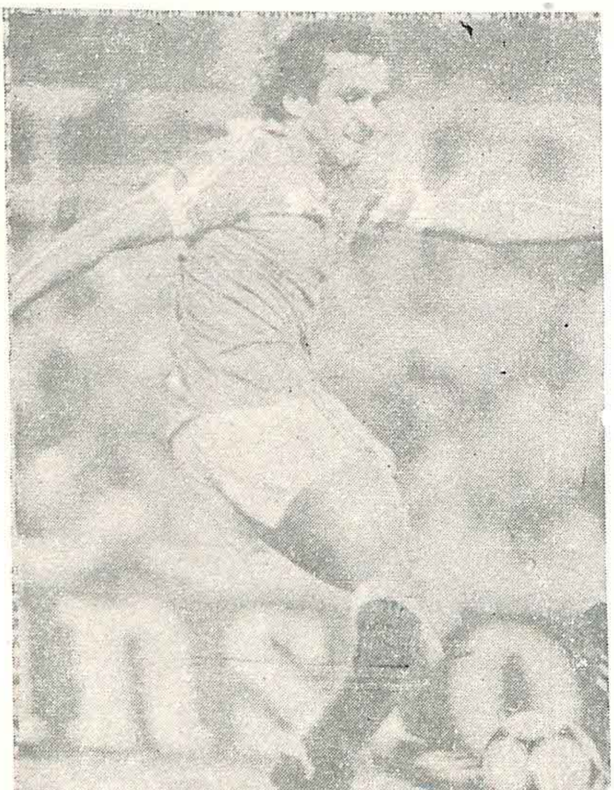
সর্বকালের সেরা উহংগার
স্যার ষ্ট্যানলী ম্যাথিয়ুজ



বিশ্বকাপ হাতে পশ্চিম-
জার্মানীর গোলরক্ষক
শেপ মেয়র



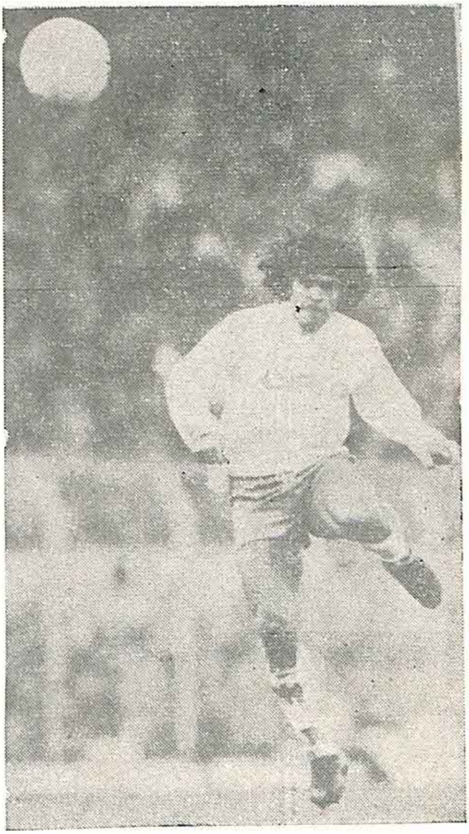
ফুটবল সম্রাট পেলে



বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মিড-ফিল্ডার ফ্রান্সের মিশেল প্লাতিনি ।



ছিয়াশির সাড়া জাগানো
ষ্ট্রাইকার ডেনমার্কের
লাউড্রপ



ছিয়াশির নায়ক ঃ তুরন্ত মারাদোনা



ছিয়াশির সর্বোচ্চ গোলদাতা ইংল্যাণ্ডের লিনেকার



আটাত্তরের বিশ্বকাপ জয়ী
আর্জেন্টিনার দল-নায়ক পাসারেলা



পঞ্চাশ দশকের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার
ফেরেঙ্ক পুসকাস



চৌত্রিশের বিশ্বকাপ জয়ী ইতালী দল

জুলেরিমে কোনো পক্ষকেই শান্ত করতে পারলেন না। তবু তিনি মাথা ঠাণ্ডা রেখে সমস্ত দেশগুলিকে আবার নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করতে বললেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু হতেই উরুগুয়ের প্রতিনিধি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'আগামী ১৯৩০ সালে আমাদের স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন হবে। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে ফুটবলকে আমরা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতে চাই। মনে হয় আমাদের স্বাধীনতার গরিমার কথা চিন্তা করে এই প্রতি-যোগিতার দায়িত্ব আমাদের হাতে তুলে দিতে কারো কোনো আপত্তি থাকবে না।'

উরুগুয়ের এই প্রস্তাবে এবার ইউরোপের দেশগুলি থমকে গেল। স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানকে তো আর তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবু ইউরোপের কিছু কিছু দেশ আপত্তি তুললো। তারা বললো—'উরুগুয়ের প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করেও বলছি, ওখানে খেলা হলে আমাদের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাবে।'

ইউরোপ গোষ্ঠির তরফ থেকে ব্যয়ভারের যুক্তি খাড়া করায় সভাকক্ষে আবার গুঞ্জন উঠলো। এবার উরুগুয়ের প্রতিনিধি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—'বিশ্বকাপ আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হলে আমরা এই ব্যয়ভার অবশ্যই গ্রহণ করবো। মনে হয় এরপর আর কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।'

উরুগুয়ের এই সাহসী প্রস্তাবের সামনে ইউরোপের কোনো দেশই আর শিরদাঁড়া সোজা রেখে আপত্তি করতে পারলো না। ফলে ঠিক হলো বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধনী আসরটি অনুষ্ঠিত হবে উরুগুয়েতে।

শুরু হলো বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে প্রস্তুতির পর্ব। মশিয়ঁ জুলেরিমের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ইউরোপীয় গোষ্ঠির মনোভাব বোঝা গেল। দেখা গেল বিশ্বকাপ আসর নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো প্রস্তুতির লক্ষণ নেই। নাম দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ পার হয়ে যাওয়া সত্বেও ইউরোপ থেকে কোনো দেশের নাম পাওয়া গেল না।

এবার সত্যি চিন্তায় পড়লেন মশিয়ঁ জুলেরিমে। তাহলে কি তাঁর স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে? সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যে মশিয়ঁ জুলেরিমে এই বিশ্বকাপ আসরের প্রাণপুরুষ, সেই তাঁর নিজের দেশ ফ্রান্স-ই এই ব্যাপারে

মুখ ফিরিয়ে ছিল সবার আগে। ফিফা সভাপতি হিসাবে তিনি তাঁর নিজের দেশের ক্রীড়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বললেন। শুধু তিনি ফ্রান্সের ক্রীড়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করলেন না, আলোচনা করলেন বেলজিয়াম, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, ইতালি প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। অনেক করে বোঝাবার পর শেষ পর্যন্ত উরুগুয়েতে খেলতে যেতে রাজি হলো কিছু দেশ। এদের মধ্যে একরকম প্রায় জোর করে খেলতে পাঠানো হলো রুমানিয়াকে।

দীর্ঘ কথাবর্তার পর বিশ্বকাপ আসরে নাম পাওয়া গেল মোট তেরোটি দেশের। এই তেরোটি দলকে ভাগ করা হলো চারটি বিভাগে। এই চারটি বিভাগ ছিল যথাক্রমে, এক নম্বর পুলে—আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, চিলি ও মেক্সিকো; দুই নম্বর পুলে—যুগোশ্লাভিয়া, ব্রাজিল, বলিভিয়া; তিন নম্বর পুলে—উরুগুয়ে, পেরু, রুমানিয়া; এবং চার নম্বর পুলে—আমেরিকা, প্যারাগুয়ে ও বেলজিয়াম।

অশুভ তেরোটি দল নিয়ে যেমন বিশ্বকাপ আসরের শুভ সূচনা হলো, তেমনি উদ্বোধনের শুভদিন হিসাবে বেছে নেওয়া হলো ১৩ই জুলাই তারিখটিকে। আসলে বিশ্বকাপ কমিটি বোঝাতে চেয়েছিলেন শুভ-অশুভ বলে যে সংস্কার চালু আছে তা আদপে মূল্যহীন—সমস্ত কাজের সাফল্যই নির্ভর করে হৃদয়ের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভ প্রচেষ্টার ওপর। যদি তা না হতো, তাহলে হয়তো বিশ্বকাপ আসর অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো, এমন বৃহত্তর আকার ধারণ করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। হতো না বিশ্বকাপের মাধ্যমে বিশ্বময় ফুটবলকে জনপ্রিয় করে তোলা।

জুলেরিমে কাপ ও প্রথম বছর : (১৯৩০)

ফুটবলের বিশ্বকাপটি মশিয়ঁ জুলেরিমে টুর্নামেন্ট কমিটিকে দান করেছিলেন বলেই এই কাপ প্রতিযোগিতার আসরে 'জুলেরিমে কাপ' নামেই ছিল বিখ্যাত। তবে এই জুলেরিমে কাপের আর একটি নাম ছিল—যে নাম দিয়েছিল বিশ্বের ফুটবলপ্রিয় মানুষ—এই নামটি কি জান?

ফুটবল। ফুটবল হলো আনন্দের খেলা, উত্তেজনার খেলা। এই খেলার উন্মাদনা রক্তের গভীরে যেন ভালোবাসার ঝংকার ছড়িয়ে যায়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই ফুটবল হলো জনপ্রিয় খেলা। এই প্রসঙ্গে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি, আন্তর্জাতিক আসরে আমরা ভারতীয়রা যাকে ফুটবল বলি, সেই খেলার আসল নাম হলো সকার। এই সকার পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই প্রিয় খেলা, ফুটবল নয়। বিদেশের ফুটবল খেলার প্রকৃত নিয়ম ও পদ্ধতির সঙ্গে সকারের মিলের চেয়ে অমিলই আছে বেশী। বর্তমানে আমাদের দেশের ক্রীড়া-পণ্ডিতেরা এতোদিনের চলতি ভুলকে সংশোধন করতে শুরু করেছেন। ইদানিং ভারতে ফুটবল খেলাকে ফুটবল না বলে সকার বলা শুরু করা হয়েছে। তবে যেহেতু আমরা ফুটবলকে সকার এবং সকার বলতে ফুটবলকে বুঝি, সেইহেতু এই গ্রন্থে ফুটবল শব্দটি ব্যবহার করছি কেবলমাত্র পাঠকদের বোঝাবার জন্য।

যে ফুটবল পৃথিবীর একটি জনপ্রিয় খেলা, সেই খেলাকে আন্তর্জাতিক আসরে প্রথম জায়গা দেওয়া হয় ১৯০০ ও ১৯০৪ সালের ওলিম্পিকে। তবে ১৯১৪ সাল থেকে এই আসর ওলিম্পিকে পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নেয়।

তোমরা নিশ্চয় জান, ওলিম্পিক আসর হলো মূলতঃ অপেশাদার খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতার ভূমি। এই আসরে কোনো পেশাদার খেলোয়াড় অংশ নিতে পারেন না। তাহলে প্রশ্ন আসে, যারা পেশাদার খেলোয়াড় তারা কি করবেন? পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সেরা খেলোয়াড়েরাই হলেন পেশাদার, তাহলে কি তারা আন্তর্জাতিক বড় আসরে আত্মপ্রকাশের কোনো সুযোগ পাবেন না? তা কি হয়, নাকি হতে পারে? ফুটবলে এই পেশাদার খেলোয়াড়দের নিয়ে যিনি প্রথম ভাবনা চিন্তা করেছিলেন তিনি হলেন ফরাসী দার্শনিক ও ফুটবল-প্রেমিক মশিয়ঁ জুলেরিমে। ভদ্রলোক ছিলেন জাত বিচারে ফরাসী ও ফুটবলের অন্যতম আন্তর্জাতিক সংস্থা ফিফার সভাপতি। এই "ফিফা" শব্দের আসল অর্থ কি জান? ফিফার অর্থ হলো—"ফেডারেশন ইন্টার-

ন্যাশনাল ছ্যা ফুটবল এসোসিয়েশন"—(FIFA)। ১৯২০ সালে তিনি এই সংস্থার সভাপতি পদ গ্রহণ করার পর ফুটবল নিয়ে নানান ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। শুরু করেন সেরা সেরা ফুটবল পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ফুটবলের বৃহত্তম স্বার্থে পেশাদার ফুটবলারদের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করেও মশিয়ঁ জুলেরিমে প্রথম দিকে সফল হলেন না। সময় গড়িয়ে গেল অনেকটা। ১৯২০ সাল থেকে আলোচনা ব্যর্থ হতে হতে ইতিহাস এসে দাঁড়ালো ১৯২৮ সালে। এই সময় আমস্টারডামে বসলো ফিফার সম্মেলন। সভাপতি জুলেরিমে আবার তাঁর প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন—'ফুটবলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়েরা সকলেই প্রায় পেশাদার। এই পেশাদার ফুটবলারদের জন্য ফুটবলে একটি সেরা প্রতিযোগিতা অবিলম্বে চালু করা হোক।'

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ইউরোপ, আমেরিকা ও ল্যাটিন-আমেরিকার সেরা ফুটবলপ্রিয় দেশগুলি। তারা সকলেই সভাপতির প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন। কিন্তু গোল বাঁধলো স্থান নির্বাচন নিয়ে। খেলা কোথায় হবে? ইউরোপ, না আমেরিকা মহাদেশে? দুই মহাদেশের মধ্যে তখন আদায়-কাঁচকলা সম্পর্ক। ইউরোপ বললো—'আমরা আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানসম্মত ফুটবলের পথিকৃত, অতএব ফুটবলের সেরা প্রতিযোগিতাটি ইউরোপের মাটিতে অনুষ্ঠিত হোক।'

ইউরোপের প্রস্তাব কিন্তু দক্ষিণ মার্কিন মুলুকের দেশগুলি মেনে নিলো না। তারা বললো—'আমরাই বা কম কিসে?' এই ব্যাপারে স্পষ্টভাবে মুখ খুললো উরুগুয়ে। তারা সরাসরি চ্যালেঞ্জ ঠুকে বললো—'আমরা বর্তমান বিশ্বে ফুটবলের একটি সেরা দেশ। প্রমাণ হিসাবে আমরা তুলে ধরতে চাই বিগত দুটি ওলিম্পিকের ফলাফলকে। গত দুটি ওলিম্পিকে আমরা সোনা জিতেছি। অতএব এই আসর আমাদের দেশের মাটিতেই অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।'

স্থান নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন দেশ যে সব মন্তব্য করতে লাগলেন তাতে আলোচনা একরকম ভেস্তে গেল বলা যায়। অনেক বুঝিয়েও সভাপতি

চরম আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিলো উরুগুয়ের প্রতিটি খেলোয়াড়। দলগত সংহতির এক অবিশ্বাস্য উদাহরণ সেদিন তারা তৈরী করলো। ঝড়ের বেগে শুরু করলো আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে। এই ম্যাচে দলের নেতৃত্ব দিলেন অ্যানাসেলমো। তাঁকে আটকে রাখার মতো একজন খেলোয়াড়ও যুগোশ্লাভ দলে ছিল না। তাঁর একক প্রচেষ্টায় অতি সহজে জয় পেয়ে গেল উরুগুয়ে। এক-আধটা গোল হলো না—গোল হলো উরুগুয়ের অনুকূলে মোট ছটি। যদি এইদিন এক ডজন গোল হতো, তাহলেও বিস্মিত হওয়ার মতো কোনো ঘটনা হতো না। যুগোশ্লাভিয়ার শোচনীয় পরাজয় ইউরোপীয় ফুটবল গরিমাকে ভূলুণ্ঠিত করলো। একরকম প্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই পরাজয়কে তাদের মেনে নিতে হলো। নিরুপায়ভাবে হজম করতে হলো ছ-ছটি গোল। ঈশ্বরের দোহাই-শেষ মুহূর্তে সিউলিক কোনোক্রমে একটি গোল দিয়ে ইজ্জত রক্ষা করতে পেরেছিলেন যুগোশ্লাভিয়ানদের। ম্যাচের ফলাফল দাঁড়ালো ৬—১। অন্যদিকে ওই একই ফলাফলে (৬—১) অতি সহজে জয় পেয়ে গেল ল্যাটিন-আমেরিকার আর একটি ফুটবলপ্রিয় দেশ আর্জেন্টিনা। ফলে প্রথম বিশ্বকাপ আসরে মুখোমুখি হলো ল্যাটিন-আমেরিকার দুটি দুর্ধর্ষ ফুটবলপ্রিয় দেশ—উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা। চির পরিচিত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ায় ফুটবলের উত্তেজনা বেড়ে গেল।

ল্যাটিন-আমেরিকার ফুটবলে এই দুটি দেশের ফুটবল সম্পর্ক অনেকটা আমাদের দেশের মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল দলের মতো। ফলে ম্যাচটিকে ঘিরে উত্তেজনা বেড়ে গেল দ্বিগুণ।

৩০শে জুলাই মন্টিভিডিও শহরের নবনির্মিত ষ্টেডিয়ামে বসলো বিশ্বকাপের প্রথম ফাইনাল আসর। মাত্র এক মাসের মধ্যে প্রচুর টাকা ব্যয় করে এই ষ্টেডিয়াম নির্মাণ করেছিলেন উরুগুয়ে সরকার। কিন্তু ম্যাচের আগে ষ্টেডিয়ামটিকে সম্পূর্ণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। তবু আয়োজনের কোনো ত্রুটি ছিল না। বিপক্ষ দল হিসাবে আর্জেন্টিনাকে পেয়ে উরুগুয়ের মানুষ যেন উত্তেজনায় আর একটু বেশী ঝলসে উঠলো। মাত্র কয়েকমাস আগে এই আর্জেন্টিনা দলের কাছে তাদের হার হয়েছে। এবার সেই পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ তাদের নিতেই হবে। অন্যদিকে আর্জেন্টিনাও

তৈরী। দলকে সমর্থন জানাবার জন্য ম্যাচের দুদিন আগে থেকে নদী পার হয়ে দলে দলে আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা আসতে লাগলেন মন্টিভিডিও শহরে।

কে জিতবে এই ঐতিহাসিক ম্যাচে বলা শক্ত ছিল। বাজির দর উঠলো চরমে। সে এক রক্ত ঝরানো দিন। উভয় দলই যথাসময় নামলো মাঠে। কিন্তু কিক-অফের সঙ্গে সঙ্গে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়েরা যেন তাদের সমস্ত আত্মপ্রত্যয়কে হারিয়ে ফেললো। প্রথম পাঁচ সাত মিনিট তারা তেড়েফুঁড়ে খেলার পর সহজেই আত্মসমর্পণ করলো উরুগুয়ের রক্ষণভাগের কাছে। গোটা মাঠ জুড়ে খেলতে লাগলো উরুগুয়ে। তাদের আটকে রাখে কার সাধ্য। তারা যেন বিশ্বকাপ জয় করবেই এমন একটি মেজাজ নিয়েই মাঠে নেমেছিল।

শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে জয় পেল উরুগুয়ে। বিপুল জনসমর্থন পিছনে নিয়ে তারা ম্যাচ জিতলো ৪—২ গোলে। এই জয় উরুগুয়ের ফুটবল গরিমাকে আরও বৃদ্ধি করলো। মাত্র দুই বছরের মধ্যে তারা জয় করলো বিশ্ব ফুটবলের দু-দুটি সেরা সম্মান।

উরুগুয়ের এই জয় এনে দিল তাদের জাতীয় জীবনে এক নতুন প্রেরণা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দিল তাদের ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বকে। মন্টিভিডিও শহর উল্লাসে ফেটে পড়লো। শত শত মানুষ নেমে এলো রাস্তায়। আলোয়, ফুলে, বাজিতে বর্ণময় হয়ে উঠলো শতবর্ষের শহর মন্টিভিডিও। বিজয়ী দলনেতা নাসাজী পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কে তৈরী সোনার পরী হাতে নিয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করলেন।

উরুগুয়ের এই জয়োল্লাসের পিছনে কারণ ছিল যথেষ্ট। তারা মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে ঘরে নিয়ে এসেছে বিশ্ব ফুটবলের দুটি সেরা সম্মান। প্রথম স্বর্ণপদক আসে ওলিম্পিক আসর থেকে এবং দ্বিতীয়টি হলো সোনার পরী— অতএব এই জয়ের উল্লাসে একটি জাতীর মাতোয়ারা হয়ে ওঠার পিছনে কারণ ছিল যথেষ্ট। ল্যাটিন-আমেরিকান গোষ্ঠির দেশগুলি বিশ্ব ফুটবলে উরুগুয়ের এই প্রাধান্যকে মেনে নিলেও ইউরোপের দেশগুলি কিন্তু সে প্রাধান্যকে স্বীকার করতে রাজি হলো না। তারা পরিষ্কারভাবে বললো—'উরুগুয়ের এই জয় মোটেই গৌরবের নয়। তারা বিশ্বের সেরা দেশগুলির সঙ্গে খেলার কোনো

হ্যাঁ—জুলেরিমে কাপের প্রচলিত নাম হলো "সোনার পরী"। কেন এই নাম সে কথা কি কেউ বলতে পারবে? আসলে এই কাপটি ছিল পরীর আকৃতিতে গঠিত এবং তা সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরী। তাই 'সোনা ও পরি' এই দুইয়ের সংমিশ্রণে গঠিত মশিয়ঁ জুলেরিমে প্রদত্ত কাপটির নাম দেওয়া হয়েছিল "সোনার পরী"।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথাও তোমাদের বলে রাখা দরকার। কারণ তাঁর নামটি না বললে এই বিশ্বকাপ পর্যায়ের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মশিয়ঁ জুলেরিমেকে যে মানুষটি সমস্ত জীবনভোর সাহায্য করে গেছেন, যাঁর প্রেরণা ও সহযোগিতায় জুলেরিমে সাহেবের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা, সেই মানুষটির নাম হলো মশিয়ঁ ডোলানী।

এবার আসা যাক প্রতিযোগিতার কথায়। আগেই বলেছি প্রথমবারের আসরে যোগ দিয়েছিল মাত্র তেরটি দেশ।

তেরোই জুলাই তারিখে বিরাট সমারোহের মধ্যে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বকাপের শুভ উদ্বোধন। এই উদ্বোধনী ম্যাচটি বর্ণাঢ্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশের মধ্যে—ফ্রান্স ও মেক্সিকো।

টসে জেতা ফ্রান্স প্রথম পেলো কিক-অফ করার সম্মান। এই ম্যাচটি কিন্তু খুব একটা উপভোগ্য হলো না। কারণ দল হিসাবে ফ্রান্স ছিল অনেক বেশী জোরদার। তারা একরকম প্রায় একতরফা ফুটবল খেলে ম্যাচ জিতে গেল ৪—১ গোলে। বলা বাহুল্য, এই আসরে প্রথম গোলটি এসেছিল ফ্রান্সের তরুণ ও জনপ্রিয় লেফট-ইন লুই লরেণ্টের পা থেকে।

ফ্রান্সের এই জয় তাদের উৎসাহী করে তুললো। অন্যদিকে ব্রাজিলকে ২—০ গোলে হারালো যুগোশ্লাভিয়া। গ বিভাগে উরুগুয়ে স্বদেশের মাটিতে দাপটের সঙ্গে ফুটবল শুরু করেছিল। তারা নিজেদের ঐতিহ্য ও গরিমাকে ধরে রাখার চেষ্টায় ছিল বদ্ধপরিকর। ফলে বিপুল জনসমর্থন ও পরিচিত পরিবেশ পেয়ে উরুগুয়ে অতি সহজে গ্রুপ লীগের দুটি খেলাতেই জয় পেয়ে গেল। তারা হারালো রুমানিয়া এবং পেরুকে।

ক্রিকেটের মতো ফুটবলও যে একটি অপ্রত্যাশিত ফলাফলের খেলা তার প্রমাণ দিল যুক্তরাষ্ট্র।

ফুটবলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র খুব একটা শক্তিশালী নয়। কাজেই সকলে ভেবেছিল চার নম্বর গ্রুপ থেকে হয়ত সেমি-ফাইনালে উঠবে বেলজিয়াম। কিন্তু কার্যত তা হলো না। পর পর দুটি ম্যাচে সবাইকে অবাক করে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ জিতলো ৩—০ গোলে। প্রথম হারালো প্যারাগুয়েকে এবং দিন কয়েক বাদে পরের ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হার স্বীকার করলো বেলজিয়াম। ফলে তারা পেল গ্রুপ লীগে শীর্ষস্থান। অন্যদিকে যে ফ্রান্স প্রথম ম্যাচে অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিয়ে সমর্থকদের মনে আশা জাগিয়ে তুলেছিল, সেই তারাই হেরে বসলো পরের দুটি ম্যাচে। ফলে চারটি গ্রুপ থেকে চারটি দল সেমি-ফাইনালে উঠলো।

শুরু হলো ফুটবল ঘিরে এক চরম উন্মাদনা। ইউরোপ থেকে মাত্র একটি দল পেল সেমি-ফাইনালে খেলার অধিকার। সেই দলটি হলো যুগোশ্লাভিয়া। বাকি যে তিনটি দল প্রথম বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালে অংশ গ্রহণ করার অধিকার পেয়েছিল—তারা ছিল যথাক্রমে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই চারটি দলের মধ্যে ক্ষমতা ও শক্তিতে দুর্বল ছিল যুক্তরাষ্ট্র দলটি। আর্জেন্টিনাকে মিলিত হতে হলো এই যুক্তরাষ্ট্র দলের সঙ্গে। ফলে তাদের ফাইনালে ওঠার প্রশ্নে কারো মনে কোনোরকম সন্দেহ ছিল না। বরং অপেক্ষাকৃতভাবে ম্যাচের গুরুত্ব ছিল উরুগুয়ে বনাম যুগোশ্লাভিয়া দলের মধ্যে খেলাটি।

উরুগুয়ে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ফুটবলের টেকনিকে যুগোশ্লাভ তখন ছিল ইউরোপের সেরা দেশের মধ্যে একটি। কাজেই তারা যে সহজে উরুগুয়েকে ছেড়ে দেবে এমন বিশ্বাস কারো মধ্যে ছিল না। তবু উরুগুয়ের খেলোয়াড়েরা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামলো। তারা জানতো, তাদের পিছনে আছে দেশবাসীর বিপুল সমর্থন। চেনা পরিবেশে বিপুল জনসমর্থনকে কাজে লাগাতে উরুগুয়ে খেলোয়াড়েরা ভুল করলো না। তাদের ফুটবল ছিল মূলতঃ শক্তির ফুটবল, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় "পাওয়ার ফুটবল"। তুলনার বিচারে যুগোশ্লাভ দল ছিল বিজ্ঞানসম্মত টেকনিকে অনেক বেশী সাবলীল। কিন্তু সেমি-ফাইনালের আসরে যুগোশ্লাভ খেলোয়াড়েরা নিজেদের দক্ষতাকে ধরে রাখতে পারলো না। সংগঠক দেশ হিসাবে

উপলব্ধি করেই মনে হয় উরুগুয়ে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া থেকে বিরত হয়েছিল। তারা জানতো, বর্তমান ফুটবলে দলগত শক্তির বিচারে ইতালি দল তাদের তুলনায় অনেক উন্নত। দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় বিশ্বকাপ আসরটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছিল রোমে—সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ছিল ইতালিয়ানদের অনুকূলে। অতএব তারা বিশ্বকাপ জয়ের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত না করার উদ্দেশ্যে রোম আসর থেকে নিজেদের নামটিকে সরিয়ে নিয়েছিল।

মনে মনে হেসেছিলেন বুদ্ধিমান পেজো। অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী পেজো জানতেন দলকে কিভাবে চালিত করতে হয়। তাঁর মনে ন্যূনতম সন্দেহ ছিল উরুগুয়েয়ানদের নিয়ে। কিন্তু যখন শুনলেন তারা রোমে আসছে না, তখন তিনি আশ্বস্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—'রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ইতালির দখলে থাকছে। তাদের হারাবার মতো ক্ষমতা ইউরোপীয় কোনো দেশের নেই।' যদিও ফুটবলের ক্রীড়া কৌশলে সেই সময় যথেষ্ট চমক এনেছিল অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও সুইডেন, তবু আত্মবিশ্বাসী পেজো কাউকেই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গ্রাহ্য করলেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দলীয় খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য করে বললেন—'দেখহে, আমি হারজিৎ বুঝি না। আমি চিনি সোনার পরীকে—ওই কাপটি আমার চাই। যেমনভাবে তোমরা আমাকে ওলিম্পিকের সোনা এনে দিয়েছ, ঠিক সেইভাবেই তোমরা আমায় বিশ্বকাপটি এনে দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

নির্দিষ্ট দিনে বর্ণাঢ্য পরিবেশের মধ্যে শুরু হলো ইতালীর ফুটবল আসর। আগেই বলেছি, চলতি বছরে ঠিক হয়েছিল নক আউট ভিত্তিতে খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে।

প্রথম রাউণ্ডে ইতালির খেলা পড়লো গতবারের তৃতীয় স্থান অধিকারী যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। এই ম্যাচে ইতালির খেলোয়াড়েরা অনবদ্য ছন্দময় ফুটবলের পরিচয় দিল। তাদের আক্রমণধারাকে ঠেকিয়ে রাখার কোনো ক্ষমতাই যুক্তরাষ্ট্র খেলোয়াড়দের ছিল না। মাঠের ধারে বসে পরম তৃপ্তিতে চুরুটে টান দিতে দিতে পেজো দেখলেন তাঁর ছেলেরা অসামান্য দক্ষতায় গায়ের জামা ভেজার আগেই সাত-সাতটি গোল দিয়ে বসে আছে। এই ম্যাচে ইতালির হয়ে তিনটি গোল দিলেন স্কিয়াভিও, দুটি গোল দিলেন অবসি এবং একটি করে

গোল পেলেন মির্জা ও ফেরারি। যুক্তরাষ্ট্র শেষ মুহূর্তে একটি গোল দিয়ে কোনোক্রমে নিজেদের ইজ্জত রক্ষা করেছিল। অন্যদিকে রুমানিয়াকে ২—১ গোলে হারালো চেকোশ্লাভাকিয়া, বেলজিয়ামকে ৫—২ গোলে হারালো জার্মানী এবং অবিশ্বাস্যভাবে ফ্রান্সের হার হলো ৩—২ গোলে অষ্ট্রিয়ার কাছে। আসলে ইউরোপের প্রতিটি দলই উঠে এলো দ্বিতীয় রাউণ্ডে। যে আর্জেন্টিনা গতবারে রানার্সের সম্মান পেয়েছিল, সেই তাদের ৩—২ গোলে হারিয়ে দিল সুইডেন। এই পর্যায়ের শেষ খেলায় অপ্রতিরোধ্য হাঙ্গেরী মিশরের বিরুদ্ধে সহজে জয় পেয়ে গেল। তারা ম্যাচ জিতলো ৪—২ গোলে।

প্রথম রাউণ্ডের খেলা শেষ করে শুরু হলো দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা। ফুটবলের বাতাস গরম হলো। উত্তেজনা বাড়লো। এই পর্যায়ে ছিল মোট আটটি দেশ। এই আটটি দেশ হলো যথাক্রমে ইতালি, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, সুইডেন, জার্মান, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোশ্লাভাকিয়া ও স্পেন।

ফ্লরেন্সে অনুষ্ঠিত হলো ইতালি বনাম স্পেনের খেলাটি। এই ম্যাচটিকে নিয়ে পেজোর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তিনি জানতেন, স্পেনের বুড়ো ও অভিজ্ঞ গোলরক্ষক জামোরা যতক্ষণ গোল আগলে আছেন, ততোক্ষণ কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে স্পেনকে পদানত করা যাবে। পেজো তাঁর দলের ছেলেদের সেই মতো নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেছিলেন—'দেখোহে, এই ম্যাচে আমাদের জিততেই হবে। আমাদের সামনে মস্ত বাধা হচ্ছেন বুড়ো জামোরা। ওকে কিন্তু কেউ ছেড়ো না। প্রয়োজন হলে ওর বুকের ওপর পা তুলতেও তোমরা কুণ্ঠিত হয়ো না।'

হলোও তাই।

বুড়ো জামোরা অসাধারণ ফুটবল খেললেন। তাঁর জন্য ইতালির কোনো খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভব হলো না স্পেনকে দাবিয়ে রাখা। গোটা দলটাকে জামোরা একার কাঁধে যেন তুলে নিলেন। পাঁচ-পাঁচটি অনবদ্য কর্নার স্কিয়াভিও ও মির্জার মাথা ছোঁয়ার আগেই বল হাতে তুলে নিলেন জামোরা। চেয়ারে বসে বসেই উত্তেজনায় ঘামতে লাগলেন পেজো। নির্দেশ দিতে লাগলেন মাঠের বাইরে থেকে। হঠাৎ এর ফাঁকে অঘটন ঘটিয়ে ফেললো

সুযোগ পায় নি। যদি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দলগুলি এই আসরে যোগ দিতো, তাহলে হয়তো ফলাফল অন্যরকম হতো।'

নিন্দুকে যে যাই বলুক, ইতিহাস স্বীকার করবে, প্রথম বছর বিশ্বকাপ আসরে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল উরুগুয়ে। গ্রুপ লীগে তারা একটি ম্যাচেও হারে নি। তারাই ছিল বিশ্বকাপ আসরে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ান দল।

তৃতীয় স্থান নির্বাচন নিয়ে কোনো খেলা হলো না। গোল এ্যাভারেজে এই স্থান পেল যুক্তরাষ্ট্র। ফলে দেখা গেল প্রথম বছর বিশ্বকাপে প্রথম তিনটি পুরস্কারই দখলে রেখেছে মার্কিন মুলুকের দেশগুলি। তুলনায় ইউরোপ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ।

এবার আসি প্রথম বিশ্বকাপ আসরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খবরের কথায়। বলা বাহুল্য এই আসরে তেরটি দেশের মধ্যে খেলায় সর্বসাকুল্যে গোল হয়েছিল সত্তরটি। এই সত্তরটি গোলের মধ্যে এক আর্জেন্টিনাই দিয়েছিল আঠারোটি গোল। আর আঠারোটি গোলের মধ্যে তারা গ্রুপ লীগেই দিয়েছিল দশটি গোল। প্রথম আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেলেন আর্জেন্টিনার স্ট্যাবাইল। তিনি দিয়েছিলেন মোট আটটি গোল। দ্বিতীয় স্থানটি ছিল উরুগুয়ে দলের সীর। তাঁর গোলের সংখ্যা ছিল পাঁচটি।

বিশ্বকাপ আসরে প্রথম যে খেলোয়াড়টি মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তিনি হলেন পেরুর দলনায়ক ও রাইট-ব্যাক ভিলা ক্যাসিয়াস।

প্রথম আসর সাফল্যের সঙ্গে শেষ হলো। এর পরেই কর্তারা বসলেন আলোচনায়—দ্বিতীয় বারের আসরটি কোথায় বসবে তাই নিয়ে। আগেই ঠিক ছিল বিশ্বকাপ আসর ওলিম্পিক নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে চার বছর অন্তর। অতএব পরের আসর বসবার কথা ছিল ১৯৩৪ সালে।

শুরু হলো দ্বিতীয় বারের আসর নিয়ে আলোচনার পর্ব। এবার ইউরোপ গোষ্ঠির দাবী অস্বীকার করা গেল না। মোট আটটি আলোচনার পর্ব শেষ করে বিশ্বকাপ কমিটি সিদ্ধান্ত নিলেন আগামী ১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বারের আসরটি অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যবাহী শহর রোমে। চলো রোম।

রোমের আসর : (১৯৩৪)

দ্বিতীয় বিশ্বকাপ আসর রোমে অনুষ্ঠিত হবে এই সিদ্ধান্ত কমিটি গ্রহণ করা মাত্র ল্যাটিন-আমেরিকা গোষ্ঠি পিছু হটতে শুরু করলো। গতবার উরুগুয়ের আসরে ইউরোপের অনেকগুলি সেরা দেশ অনুপস্থিত ছিল। তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রথমে যোগ দেয় নি। ফলে এবার ইউরোপ ভূ-মণ্ডলে আসর বসায় মার্কিন মুলুকের দেশগুলি যথাসম্ভব নীরবতা পালনের ভূমিকা নিলো। আগেই বোঝা গিয়েছিল রোমে আসর বসলে, গতবারের চ্যাম্পিয়ান উরুগুয়ে যোগ দেবে না। তারা ইউরোপ গোষ্ঠির অপমানের শোধ নিতে চায়।

হলোও তাই।

উরুগুয়ে স্পষ্ট ভাষায় বললো, তাদের পক্ষে ইউরোপে গিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। তাদের মতে গলা মেলাতে দেখা গেল পেরু, চিলি ও গতবারের রানার্স আর্জেন্টিনাকে। একমাত্র ব্রাজিল কোনো মন্তব্য করলো না। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে মশিয়ঁ জুলেরিমে প্রতিনিধি পাঠালেন মার্কিন মুলুকে। দফায় দফায় আলোচনা হলো। শেষ পর্যন্ত অংশ নিতে রাজি হলো আর্জেন্টিনা ও যুক্তরাষ্ট্র।

ইউরোপ গোষ্ঠির উচ্ছ্বাসের শেষ নেই। এবার তারা নিজেদের মাটিতে ফুটবলের শ্রেষ্ঠ চেহারাটি তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। ঝাঁকে ঝাঁকে যোগ দিল ইউরোপের সেরা দলগুলি। সংগঠক দেশ হিসাবে ইতালির প্রাধান্যকে খর্ব করতে এই আসরে যোগ দিল ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, মিশর, রুমানিয়া ও জার্মানী। সর্বসাকুল্যে দলের সংখ্যা দাঁড়ালো চোদ্দটি। ঠিক হলো এবারের আসরটি হবে নক আউট ভিত্তিতে।

ইতিমধ্যে ইউরোপের বাতাস গরম হতে শুরু করেছে। বিশ্ব ফুটবলে প্রাধান্য নেওয়ার চেষ্টায় নব উদ্যোগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তখন ইতালি। সামরিক শাসনে শৃঙ্খলিত ইতালিয়ান ফুটবলারেরা মাত্র বছর দেড়েক আগে অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিয়েছেন ওলিম্পিক আসরে। বিগত দুই বছরের ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান ও বিশ্বকাপ জয়ী উরুগুয়ের আধিপত্যকে খর্ব করে তারা তখন গোটা বিশ্বকে দখল করার চেষ্টায় ব্যস্ত। ইতালীর এহেন দাপট

ফাইনালকে কেন্দ্র করে রোম শহরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ালো। ইতালি যে সহজে জয় পেয়ে যাবে এমন বিশ্বাস কোনো সুধী ইতালি সমর্থকের মনে ছিল না। সবচেয়ে বেশী চিন্তার মধ্যে ছিলেন কোচ পেজো। সারাটা দিন ধরে তিনি নানান পরিকল্পনা মাথায় আঁটতে লাগলেন। চেকো-শ্লোভাকিয়া যে ফর্মে ফুটবল খেলছে তাতে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ গড়ে তোলা খুবই কঠিন ছিল। তবু পেজো তাঁর খেলোয়াড়দের বললেন আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে। ইতালির সমর্থকেরা পতাকা আর পটকা নিয়ে মাঠে হাজির হলেও, তাদের মধ্যে বড় ধরনের কোনো উচ্ছ্বাস দেখা গেল না।

কিক-অফের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের গতিতে শুরু হলো ফুটবল। দ্বিতীয় বিশ্বকাপ আসরে এটাই ছিল সেরা ম্যাচ। পাক্কা সত্তর মিনিট দুই দলই সমান তালে আক্রমণ চালিয়েও কোনো গোলের মুখ দেখতে পেলো না। এরপরই চেক দলের পাক একটি গোল করে বসলেন। এই গোল পাওয়ার পর চেক খেলোয়াড়দের ধারণা জন্মালো তারা যেন ম্যাচ জিতে গেছে। ফলে তারা আক্রমণের চাইতে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হলো বেশী। চেক দলের এই স্ট্যাটিজি যে কতটা ভুল ছিল তা বোঝা গেল কিছু পরেই। ইতালির খেলোয়াড়েরা চকিতে ঝড়ের বেগে ওপরে উঠে এলো। গাইতির বাঁ পায়ে তুলে দেওয়া একটি বলকে অসাধারণ তৎপরতায় ভলি করে দর্শনীয় একটি গোল দিলেন ওরসি। এই ধরনের গোল ওরসির পক্ষে হাজার চেষ্টা করেও দ্বিতীয়বার করা হয়ত আর সম্ভব হতো না।

গোল শোধ হওয়ার পরই খেলার মধ্যে উত্তেজনা দেখা গেল। দুই পক্ষই মরিয়া। শেষ পর্যন্ত ৯৭ মিনিটের মাথায় জয়সূচক গোল দিলেন স্কিয়াভিও। এই গোলের সুবাদেই দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ঘরে তুললো ইতালি।

জয় উচ্ছ্বাসে পেজো বললেন—'আমি খুশী। আমি তৃপ্ত। আমি দেশবাসীকে কথা দিয়েছিলাম বিশ্বকাপ এনে দেব, সে কথা আমি রেখেছি।'

বলা বাহুল্য দ্বিতীয়বারের আসরে মোট ষোলোটি খেলায় গোল হয়েছিল সর্বসাকুল্যে সত্তরটি। এর মধ্যে দলগত বিচারে সর্বাধিক গোল পেয়েছিল ইতালি—মোট বারোটি।

আর সর্বোচ্চ গোলদাতা ?

এবারের আসরে চারটি গোল দিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেয়েছিলেন মোট তিনজন খেলোয়াড়। এই তিনজন হলেন যথাক্রমে ইতালির স্কিয়াভিও, চেক দলের নেজলি ও জার্মানের কোনেন।

দ্বিতীয় বিশ্বকাপ আসর শেষ করে শুরু হলো তৃতীয়বারের প্রস্তুতি। ইতালির সাফল্য ইউরোপের দাবীকে আরও বেশী জোরদার করে তুলেছিল। তবে ল্যাটিন-আমেরিকার পক্ষ থেকে এবার এলো আর্জেন্টিনার দাবী। প্রথম বছর বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় তারা সংগঠক দেশ হওয়ার দাবী জানিয়েছিল, কিন্তু সেবার ফিফা সংস্থা গুরুত্ব দিয়েছিলেন উরুগুয়ের প্রাধান্যকে। এবার ফিফার তরফ থেকে সকলের সব দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হলো, তৃতীয় বিশ্বকাপ আসর মশিয়ঁ জুলেরিমের সম্মান রক্ষার্থে ফ্রান্সেই অনুষ্ঠিত হবে। ফিফার এই সিদ্ধান্তে ইউরোপীয় দেশগুলি খুশী হলেও খুশী হতে পারলো না আর্জেন্টিনা সহ ল্যাটিন-আমেরিকার অন্য দেশগুলি। একমাত্র ব্রাজিল ছাড়া অন্য কারো মধ্যে কোনোরকম উৎসাহ দেখা গেল না।

এবার আমাদের চোখ রাখা যাক ১৯৩৮ সালে—ফ্রান্সের দিকে।

ফ্রান্সেও ইতালি চ্যাম্পিয়ান হলো : (১৯৩৮)

১৯৩৮ সাল।

সমগ্র ইউরোপ জুড়ে তখন চলেছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে বারুদের গন্ধ। আকাশে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান, সীমানা অঞ্চলগুলিতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সাজোয়া বাহিনী। এই চরম অবস্থার মধ্যে নাৎসী নেতা হিটলার হঠাৎ আক্রমণ করে বসলেন অষ্ট্রিয়াকে। ফলে অষ্ট্রিয়ার চারজন নামী ফুটবলার বন্দী হলেন জার্মানদের হাতে। তাদের বাধ্য করা হলো জার্মানীর হয়ে খেলার জন্য। কাজেই এমত অবস্থায় অষ্ট্রিয়ার পক্ষে ফ্রান্সে দল পাঠানো সম্ভব হলো না। পরিস্থিতি এতই জটিল হয়ে উঠেছিল যে ফ্রান্সে আসর শেষ পর্যন্ত বসবে কিনা তাই নিয়ে যথেষ্ট

স্পেন দল। ল্যাঙ্গারোর কাছ থেকে বল পেয়ে চকিতে দর্শনীয় গোল দিয়ে বসলেন বিগুইরো।

ইতালি পিছিয়ে যাওয়া মাত্র মাঠের উত্তেজনা বেড়ে গেল। হাফ টাইমের সময় পেজো তাঁর খেলোয়াড়দের ডেকে বললেন—'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি চাই বিশ্বকাপ। এর জন্য যদি তোমাদের নৃশংস হতে হয়—তাই হবে।'

দ্বিতীয়ার্ধে ইতালিয়ানরা গোল করার জন্য ক্ষেপে উঠলো। তারা এবার বেদম পেটাতে লাগলো স্পেনিয় খেলোয়াড়দের। আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলেন জামোরা। তবু তিনি মাঠের বাইরে গেলেন না। ইতালির সৌভাগ্য, শেষ মুহূর্তে তারা কোনোক্রমে একটি গোল পেয়ে গেল। দূর পাল্লার চমৎকার শটে গোল দিলেন মীর্জা।

প্রথম দিনের খেলা শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। পরের দিন রিপ্লে। পেজো জানতেন, এইদিন ইতালির জয় পেতে কোন অসুবিধে হবে না। মাঠে নামার আগে স্পেন কর্তৃপক্ষ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। মাঠে যে তারা এগারো জনের একটি দল নামাবেন সে রকম খেলোয়াড় কোথায়—সবাই তো অসুস্থ। গত দিনের মারের চোটে জামোরার অবস্থা খুবই সঙ্গীন। তবু তারা কোনোরকমে একটা দল খাড়া করে মাঠে নামালো। জামোরাকে মাঠে নামতে না দেখে পেজো মহাখুসী। বুঝলেন, গতকাল তাঁর নির্দেশ মতো খেলে তাঁর ছেলেরা ফাইনালে ওঠার পথকে অনেকখানি সুগম করে নিয়েছে। এই দিন তিনি চিন্তাশূন্য মন নিয়ে গ্যালারিতে গিয়ে বসেছিলেন। আশ্চর্য, এমন একটি ক্ষতবিক্ষত দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিততেও হিমসিম খেলো ইতালি। কোনোরকমে এইদিন তারা একটিমাত্র গোল দিয়ে উঠে এলো সেমি-ফাইনালে।

অন্যদিকে ভয়ঙ্কর লড়াই হলো জার্মান ও সুইডেন দলের মধ্যে। একমাত্র অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে এই ম্যাচে ২—১ গোলে জয় পেয়ে গেল জার্মান দল। ঠিক এই একই ফলাফলে ম্যাচ হারলো হাঙ্গেরী। তারা গোল খাওয়ার পর এমন মাথা গরম করে ফেলেছিল যে তাদের পক্ষে আর খেলা সম্ভব হলো না। অন্য আর একটি ম্যাচে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বীতার পর চেকোশ্লাভাকিয়ার হাতে

৩—২ গোলে ম্যাচ হারতে বাধ্য হলো সুইজারল্যাণ্ড। ফলতঃ এবার অবশিষ্ট চারটি দল মিলিত হলো সেমি-ফাইনালের জন্য।

সেমি-ফাইনালের প্রথম খেলাটি অনুষ্ঠিত হলো চেকোশ্লাভাকিয়া বনাম জার্মানির মধ্যে। দল বিচারে জার্মানদের তুলনায় চেক দলটি যে অনেক বেশী দক্ষ তা স্পষ্ট বোঝা গেল। অভিজ্ঞ জার্মান খেলোয়াড়দের তারা এইদিন মাঠে দাঁড়াতেই দিলো না। চেক দল খেললো ডাবলু ফর্মে। তারা তড়িৎ-গতিতে নতুন পদ্ধতিতে ফুটবল খেলে সবাইকে বুঝিয়ে দিলো, তারা ফুটবলে কতখানি এগিয়ে গেছে। তাদের গতির সঙ্গে জার্মান খেলোয়াড়েরা কোনো সময়ের জন্য পেরে উঠলো না। ঝড়ের বেগে ফুটবল খেলে চেকোশ্লাভাকিয়া ম্যাচ জিতে গেল ২—১ গোলে।

মিলানে ইতালি হলো অষ্ট্রিয়ার মুখোমুখি। ফুটবলে অষ্ট্রিয়ার তখন চমৎকার আধিপত্য। পেজোর যে দুশ্চিন্তা ছিল না তা নয়। তাঁকে ম্যাচের আগে বেশ চিন্তান্বিত বলে মনে হচ্ছিল। তিনি এইদিন ম্যাচ জেতার জন্য খেলোয়াড়দের নানান ভাবে উস্‌কে দিলেন। শক্তিতে অষ্ট্রিয়াও কম যায় না। তারাও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করলো। সে এক দমবন্ধ অবস্থা। কোনো-ক্রমে গোল পেলো ইতালি। গোল করলেন ওয়াইতা। এই গোল হওয়ার পর অষ্ট্রিয়া সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইতালির ওপর। চললো একটানা বোমারু আক্রমণ। এই সময় কমপক্ষে তিন-তিনবার গোলের সুযোগ হাতছাড়া করলো অষ্ট্রিয়া। একেবারে অন্তিম লগ্নে অষ্ট্রিয়ার জিসেক যে অবস্থায় বল পেয়েছিলেন, তাতে কেন যে গোল হলো না সেকথা বলা খুবই শক্ত। উত্তেজিত পেজো শংকিত অবস্থায় বার বার ঘড়ি দেখতে লাগলেন। জিসেকের শট যখন ইতালির গোলরক্ষককে পরাস্ত করে বারপোষ্টে ছুঁয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল, তখন অনেকেই দেখেছিলেন পেজোকে দুহাতে চোখ ঢাকতে। খেলা শেষের বাঁশি বাজলো ইতালির খেলোয়াড়েরা জয় উল্লাসে মাঠের বাইরে বেরিয়ে এলো।

১০ই জুন—রোমে অনুষ্ঠিত হলো ফাইনাল।

এই ফাইনালের তিনদিন আগে অষ্ট্রিয়াকে ৩—২ গোলে হারিয়ে তৃতীয় স্থান পেলো জার্মানী।

সন্দেহ দেখা গেল। ঈশ্বরের দোহাই, শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে উদযাপিত হলো তৃতীয় বিশ্বকাপ আসর। এই আসরে একমাত্র ব্রাজিল ছাড়া অন্য কোনো ল্যাটিন-আমেরিকান দলকে হাজির হতে দেখা গেল না। ইউরোপ থেকে এলো হাঙ্গেরী, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোশ্লাভিয়া, সুইডেন, জার্মানী ও রুমানিয়া। অনেকে আশা করেছিলো হয়তো শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড এই আসরে যোগ দিতে পারে। কিন্তু তা হলো না। ফলে মোট ষোলোটি দেশকে নিয়ে বসলো ফ্রান্সের বিশ্বকাপ আসর। এই আসরে নবাগত দেশ হিসাবে নাম দিলো কিউবা, ডাচ-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ও পোল্যাণ্ড।

ঠিক হলো গতবারের মতো এবারেও খেলা হবে নক আউট পদ্ধতিতে।

বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে পণ্ডিতেরা গবেষণায় বসলেন। সকলেই বললেন, বর্তমান দলগুলির যা অবস্থা তাতে মনে হয় ইতালি চ্যাম্পিয়ান হবে। অনেকে আবার ঝুঁকলেন হাঙ্গেরী ও জার্মানীর পক্ষে। ইতালির দল আগের মতো ছিল না। গতবারের বিশ্বকাপ জয়ী দল থেকে বাদ পড়লেন অনেকে। দেখা গেল দলে অনেক নতুন মুখ। একমাত্র আত্মবিশ্বাসী মনোভাবের পরিচয় দিলেন ইতালী দলের দাম্ভিক ম্যানেজার স্বয়ং পেজো। তিনি বললেন—'যে অবস্থাই তৈরী হোক না কেন, ইতালী জিতছে।' আসলে অষ্ট্রিয়া যোগ না দেওয়ায় ইতালীর পক্ষে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছিল। অষ্ট্রিয়া তখনকার ফুটবলে ছিল একটি সেরা দেশ। তবে পেজো যে তাঁর দলের শক্তি সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলেন তা নয়। তাঁর সন্দেহ ছিল হাঙ্গেরীকে নিয়ে। এই হাঙ্গেরী মাত্র কয়েক মাস আগে অষ্ট্রিয়াকে হারিয়েছিল ৮—৩ গোলে। ওদের দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন সারোসি। অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে ফ্রান্সে শুরু হলো তৃতীয় বিশ্বকাপ আসর। প্রথম রাউণ্ডের খেলায় অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিলো হাঙ্গেরী ও ফ্রান্স। নবাগত ডাচ-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া দলের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরী জিতলো ৬—০ গোলে। ফ্রান্স ২—১ গোলে হারালো বেলজিয়ামকে।

অঘটন ঘটালো এই পর্যায়ে নবাগত কিউবা দল। তারা অভিজ্ঞ রুমানিয়া দলটিকে একরকম প্রায় কোণঠাসা করে রেখেছিল। প্রথম দিন শেষ মুহূর্তে গোল শোধ করে রুমানিয়া কোনোরকমে সম্মান বাঁচালেও দ্বিতীয় দিন তারা

পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলো। প্রথম ম্যাচটি শেষ হয়েছিল ৩—৩ গোলে। দ্বিতীয় দিন কিউবা জয় পেল ২—১ গোলে। কিউবার এই জয় ইউরোপের দেশগুলিকে নতুন ভাবনায় ফেললো। অন্যদিকে শক্তিশালী নাৎসী জার্মান দল হেরে বসলো সুইজারল্যাণ্ড দলের কাছে। এই ম্যাচটিও দুদিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম দিন ফলাফল ছিল ১—১ এবং দ্বিতীয় দিন সুইজারল্যাণ্ড জয় পেল ৪—২ গোলে।

জোরদার লড়াই হলো মার্সাইতে। ইতালির মুখোমুখি হলো নরওয়ে দল। এইদিন মাঠে নেমে ইতালির খেলোয়াড়েরা বিদ্রূপের মধ্যে পড়লো। রাজনৈতিক কারণে ফ্রান্সের দর্শকরা ইতালীর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে লাগলো। এমন যে কিছু একটা ঘটবে ব্যাপারটা আগেই কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন পেজো। তাই তিনি তাঁর দলের খেলোয়াড়দের আগেই বলে রেখেছিলেন—'তোমরা একদম মাথা গরম করবে না। বরং মাঠে নেমে ফ্যাসিষ্ট সেলুট দেবে। হাত নামাবে না যতক্ষণ না চীৎকার থামছে।'

হলোও তাই। চীৎকারে ডুবে গেল সারা মাঠ। এরপর খেলা শুরু হলো উত্তেজনার মধ্যে। নরওয়ে দলটি অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিয়ে চেপে ধরলো ইতালিকে। প্রথমার্ধেই তারা একটি গোল দিয়ে এগিয়ে গেল। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে ম্যাচটি হয়ে উঠেছিল উপভোগ্য। খেলা একসময় যে ভাবে চলছিল তাতে ফলাফল মনে হয়েছিল নরওয়ের দিকে ঝুঁকবে। আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল পেজোর। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকায় দ্বিতীয়ার্ধের অন্তিম লগ্নে গোল শোধ করলো ইতালি। অতিরিক্ত সময় খেলা চললো। দমের ঘাটতি পড়ায় নরওয়ের খেলোয়াড়েরা আক্রমণ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখলো। তারা চেয়েছিল এদিনের ম্যাচটিকে অমীমাংসিতভাবে শেষ করতে। কিন্তু তাদের এই ভুল নীতির ফলে ফুটবলের গতি বদল হলো। অভিজ্ঞ ইতালি দল তাদের দুর্বলতার সুযোগ ধরে নিয়ে উঠে এলো আক্রমণে। অতিরিক্ত সময়ে ফিওলা দর্শনীয় একটি গোল করে পেজোর মুখে হাসি ফোটালেন।

স্টসবোরোর ভিজে মাঠে প্রচণ্ড লড়াই হলো ব্রাজিল ও পোল্যাণ্ড দলের মধ্যে। এই ম্যাচে অবিশ্বাস্য ঝড়ের গতিতে ফুটবল খেলে ব্রাজিল ম্যাচ

জিতলো ৬—৫ গোলে। অন্য আর একটি ম্যাচে চেক দল সরাসরি ম্যাচ জিতলো ৩—০ গোলে।

প্রথম রাউণ্ডের খেলা শেষ করে শুরু হলো দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা। ষোলোটি দল এবার এসে দাঁড়ালো আটটি দলে। এই পর্যায়ের খেলায় নবাগত কিউবা দল শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হলো সুইডেনের কাছে। ৮—০ গোলে ম্যাচ জিতলো সুইডেন। উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে হাঙ্গেরী অতি সহজে ২—০ গোলে জয় পেল সুইজারল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে। ইতালির বিরুদ্ধে ফ্রান্স একরকম দাঁড়াতেই পারলো না বলা যায়। প্রচুর জনসমর্থন পাওয়া সত্বেও ফ্রান্সের খেলোয়াড়েরা কোনোরকম আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিতে পারলো না। ইতালি ম্যাচ জিতলো ৩—০ গোলে। এই ম্যাচে দুটি দর্শনীয় গোল দিলেন ফিওলা। ব্রাজিল বনাম চেকোশ্লাভাকিয়ার খেলাটি বেশ জমেছিল। প্রথম দিন ম্যাচ শেষ হয়েছিল ১—১ গোলে। দ্বিতীয় দিন ব্রাজিল জিতলো ২—১ গোলে।

এই পর্যায়ের খেলা শেষ করে সেমি-ফাইনালে উঠলো চারটি দেশ। এই চারটি দেশ হলো যথাক্রমে ইতালি, ব্রাজিল, হাঙ্গেরী ও সুইডেন।

মার্সাইতে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম সেমি-ফাইনাল। এখানে মুখোমুখি হলো ইতালি ও ব্রাজিল। এই ম্যাচে ব্রাজিল তাদের বেশ কিছু খেলোয়াড়কে রদবদল করলো। না করে উপায় ছিল না, কারণ গত ম্যাচে অনেকেই হয়েছেন আহত। পেজো কিন্তু তাঁর দলের কোনো পরিবর্তন করলেন না। তিনি তাঁর খেলোয়াড়দের বলে দিলেন আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে। ওদের সঙ্গে যে গায়ের জোরে পেরে ওঠা সম্ভব হবে না এই ধারণা পেজোর ছিল। কেবল ফিওলাকে তিনি নির্দেশ দিলেন পিছন থেকে খোঁচা দিয়ে ব্রাজিল খেলোয়াড়দের রাগিয়ে দিতে। ফিওলা মাঠে নেমে তাই করলেন। এই কৌশলে কাজ হলো। ব্রাজিলিয়ান ডিফেনডারেরা খোঁচা খেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তারা মাথা গরম করায় তাদের মধ্যে কোনো উচ্চাঙ্গের ক্রীড়াশৈলী প্রকাশ পেল না। ফলে ফাঁকায় দাঁড়ানো ইতালির কুশলী ফরোয়ার্ড কলোসী দিলেন প্রথম গোল। দ্বিতীয় গোল এলো পেনাল্টি থেকে।

অন্যদিকে হাঙ্গেরী অতি সহজে সুইডেনকে শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত করে

উঠে এলো ফাইনালে। এই ম্যাচে হাঙ্গেরী দলের নেতৃত্ব দিলেন সারোসি। তাঁকে আটকে রাখার ক্ষমতা সুইডেন দলের ছিল না। ফলে হাঙ্গেরী গায়ের জামা না ভিজিয়েই অতি সহজে উঠে এলো ফাইনালে।

১৯শে জুলাই, কলম্বাস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো ফাইনাল ম্যাচটি। এই ম্যাচ সম্পর্কে গবেষকদের ধারণা ছিল হাঙ্গেরী যেভাবে প্রথম রাউণ্ড থেকে খেলে আসছে তাতে তাদের পক্ষে ইতালিকে হারানো খুব একটা কঠিন হবে না। ফলে হাঙ্গেরী দল এই ম্যাচ সম্পর্কে অতি মাত্রায় ছিল আত্মবিশ্বাসী। তারা ভেবে রেখেছিল বিশ্বকাপ ইতিমধ্যে তাদের দখলে এসে গেছে।

বলা বাহুল্য, এবারের ফাইনালে ফ্রান্স কর্তৃপক্ষ বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিলেন। খেলা শুরু হওয়ার আগে তাঁরা কড়া পাহারায় বসালেন পেজোকে। গত-বারের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই মনে হয় কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা পরিষ্কারভাবে পেজোকে বললেন—'আপনি মাঠের বাইরে থেকে কোনোরকম নির্দেশ দিতে পারবেন না। যদি আপনি নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো।' ফলে পেজোকে হাত-পা গুটিয়ে গ্যালারীতে চুপচাপ বসে থাকতে হলো।

ফাইনালে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ইতালি কিন্তু আশাতীত ভালো ফুটবলের পরিচয় দিল। চমৎকার বোঝাপড়ার মধ্যে তারা খেলা শুরু করেছিল। হাঙ্গেরীও কম গেল না। কিন্তু তাদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস কাল হলো। শেষ পর্যন্ত ৪—২ গোলে ম্যাচ জিতলো ইতালি। খেলা শেষের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে পেজো বীরদর্প পদক্ষেপে গ্যালারী থেকে নেমে এলেন। মুখে হাসি। ব্যক্তিত্বে অহংকার গরিমা স্পষ্ট।

দাম্ভিক পেজো প্রথম বললেন—'আমার খেলোয়াড়েরা অসাধারণ খেলেছে। মনে হয় এবারের জয় সম্পর্কে কারো কিছু বলার নেই। ইতালি যে বর্তমান বিশ্বে একটা শ্রেষ্ঠ দল নিশ্চয় তা আপনারা মানতে বাধ্য। আমার খেলোয়াড়দের এই জয়ের জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন।'

এই আসরে তৃতীয় স্থান পেল ব্রাজিল। তারা ম্যাচ জিতলো ৪—২ গোলে। এবারে সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হলেন ইতালির ফিওলা। পেশাদার জগতে তাঁর বাজার দর বেড়ে হলো দ্বিগুণ। এই আসরে ১৫টি গোল দিয়ে

শ্রেষ্ঠ স্থান পেলো হাঙ্গেরী। ব্রাজিল দিয়েছিল সর্বসাকুল্যে ১৪টি গোল। সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেলেন ব্রাজিলের লিওনিডাস। তাঁর দেওয়া গোলের সংখ্যা ছিল মোট ৮টি।

তৃতীয় বিশ্বকাপ আসর শেষ হওয়া মাত্র শুরু হলো বিশ্বযুদ্ধ। পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লো সেই আগুন। গোটা ইউরোপ হলো এই ভয়াবহ যুদ্ধে বিধ্বস্ত। ফলে ১৯৪২ সালে চতুর্থ বিশ্বকাপ আসর অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হলো না। এরজন্য অপেক্ষা করতে হলো আরো দীর্ঘদিন।

বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হতে হতে সময় নিলো প্রায় সাত-সাতটা বছর। এই যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হলো অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া জাপান ও ইতালি। যুদ্ধ শেষ হলেও ইউরোপের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। ফলে এই জটিল পরিবেশের মধ্যে বিশ্ব ফুটবলের ভাবনা তখন আর কারো মাথায় থাকলো না। ফলে পেশাদার ফুটবলের সেরা প্রতিযোগিতা বিশ্বকাপ আসর থেমে গেল।

ব্রাজিলে উরুগুয়ে চ্যাম্পিয়ান : (১৯৫০)

দীর্ঘ বারো বছর যুদ্ধের বিভীষিকা পার করে ১৯৫০ সালে আবার নতুন করে বাজল ফুটবলের মাদল। এবার চতুর্থ বিশ্বকাপের আসর বসলো এক যুগ বাদে ল্যাটিন-আমেরিকার ফুটবলের একটি সেরা দেশ ব্রাজিলে।

১৯৪৬ সাল থেকে চতুর্থ বারের আসর শুরু করা যায় কিনা তা নিয়ে আলোচনা প্রথম শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেদিনের এই আলোচনা বিশেষ কোনো ফলাফল দাঁড় করাতে পারে নি। কি করে পারবে—গোটা ইউরোপ মহাদেশ যে মহাযুদ্ধের দাপটে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। মানুষের দুর্দশার শেষ নেই। মানুষ এখন সবার আগে দুমুঠো পেট ভরে খেতে চায়। কাজেই এই অবস্থায় ফুটবল নিয়ে মাতামাতি করার মতো মানসিক ইচ্ছা ইউরোপের কোনো দেশের ছিল না। ফলে আলোচনা দীর্ঘ হলো। শেষ পর্যন্ত দফায় দফায় আলোচনা করে শেষে ঠিক হলো আগামী দিনে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর আবার অনুষ্ঠিত হবে ১৯৫০ সালে।

এবার প্রশ্ন—কোথায় অনুষ্ঠিত হবে এই আসর? ইউরোপের কোনো দেশই এতো বড়ো অর্থযজ্ঞের দায়িত্ব নিতে রাজি হলো না। এবার প্রস্তাব দিলো ব্রাজিল। তারা বললো—'আমাদের দায়িত্ব দিলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

আপত্তি উঠলো না কোনো। ফলে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হলো যুদ্ধোত্তর বিশ্বে প্রথম বিশ্বকাপ আসর।

ব্রাজিলের অনুষ্ঠিত আসরে ইউরোপের বহু সেরা দেশ অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলো না একমাত্র আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কারণে। যোগদানে বিরত থাকলো অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, জাপান, ফ্রান্সের মতো ফুটবলের সেরা দেশগুলি। বহু কষ্টে হাজির হলো সুইজারল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ইতালি, স্পেন ও ইংল্যাণ্ড। এবারের আসরে প্রথম যোগ দিয়েছিল ইংল্যাণ্ড। ল্যাটিন-আমেরিকার প্রায় প্রতিটি দেশই এই আসরে উপস্থিত ছিল। সর্বসাকুল্যে মোট তেরোটি দেশ নিয়ে শুরু হলো লীগভিত্তিক খেলা। ঠিক হলো এবার চূড়ান্ত পর্বের খেলা নিষ্পত্তি হবে লীগ পদ্ধতির মধ্যে।

তেরোটি দেশকে ভাগ করা হলো চারটি বিভাগে। এই চারটি বিভাগের মধ্যে দুটি বিভাগে রাখা হলো চারটি করে দল। একটি বিভাগে থাকলো তিনটি দল, অন্য গ্রুপে থাকলো মাত্র দুটি দল। ক বিভাগে সংগঠক দেশ হিসাবে ব্রাজিলের সঙ্গে জায়গা পেলো যুগোশ্লাভিয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও মেক্সিকো। খ বিভাগে জায়গা পেলো স্পেন, ইংল্যাণ্ড, চিলি, আমেরিকা। গ বিভাগে তিনটি দল হিসাবে স্থান হলো সুইডেন, প্যারাগুয়ে ও ইতালি এবং ঘ বিভাগে দুটি দল হিসাবে দেখা গেল উরুগুয়ে ও বলভিয়াকে।

ব্রাজিলের মস্ত শহর রিও-ডি-জেনারিওতে নদীর ধার ঘেষে তৈরী করা হলো বিশাল একটি ত্রিতল স্টেডিয়াম। বলা বাহুল্য বর্তমান বিশ্বে এটাই হলো সর্ববৃহৎ ফুটবল স্টেডিয়াম। এখানে দর্শক আসন কমকরে দুই লক্ষের বেশী। হাজার চেষ্টা করেও ব্রাজিলের কর্তারা স্টেডিয়ামটিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তৈরী করতে পারলো না। চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না তাদের। দৈনিক চব্বিশ ঘণ্টা দু-হাজার শ্রমিককে কাজে লাগিয়েও স্টেডিয়ামটি নির্দিষ্ট সময়ে অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

২৪শে জুন ১৯৫০।

রিও-ডি-জেনারিও শহরের নবনির্মিত মারকানা স্টেডিয়ামে এক বর্ণাঢ্য পরিবেশের মধ্যে শুরু হলো বিশ্বকাপের শুভ উদ্বোধন। উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে শান্তির প্রতীক হিসাবে উড়ানো হলো শ্বেতশুভ্র পাঁচ হাজার পায়রা। বাজি ফুটলো। বাজনা বাজলো। উড়ানো হলো প্রতিটি দেশের জাতীয় পতাকা।

উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেতে ব্রাজিল দলের কোনো অসুবিধে হলো না। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নেমে তারা ছেলেখেলা করে ম্যাচ জিতলো মেক্সিকোর বিরুদ্ধে। জয় এলো ৪—০ গোলে।

ক বিভাগের অন্য একটি খেলায় যুগোশ্লাভিয়া জয় পেলো ৩—০ গোলে সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ফলে এই গ্রুপের সেরা ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হলো ব্রাজিল বনাম যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে। কয়েকদিন আগে যুগোশ্লাভিয়া দল মেক্সিকোকে হারিয়েছে। ফলে এই ম্যাচটিকে ঘিরে ব্রাজিলিয়ানদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিন্তু এই ম্যাচটির আগে ব্রাজিল একটি অঘটন ঘটালো। তারা সুইজারল্যাণ্ড দলের সঙ্গে কোনোক্রমে শেষ মুহূর্তে গোল শোধ করে ম্যাচ অমীমাংসিত রেখে নিজেদের সম্মান বাঁচালো। শোকে মুহ্যমান ব্রাজিল সমর্থকেরা এই ব্যর্থতাকে মন থেকে মেনে নিতে পারলো না। সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলো স্থানীয় পত্রিকাগুলি। ফলে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে ব্রাজিলের খেলোয়াড়েরা ম্যাচ জেতার জন্য মরিয়া হয়ে মাঠে নামলো।

উত্তেজনায় গোটা শহর তখন টগবগ করে ফুটছিল। ম্যাচ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই এক মস্ত অঘটন ঘটে গেল যুগোশ্লাভ ড্রেসিং রুমে। তড়িঘড়ি করে ড্রেসিং রুমের বাইরে আসতে গিয়ে মাথা ফাটালেন যুগোশ্লাভ দলের শ্রেষ্ঠ তারকা মিতিক। মিতিকের এই আঘাতই যুগোশ্লাভ দলের দুর্ভাগ্য বহন করে আনলো। তিনি ব্যাণ্ডেজ মাথায় জড়িয়ে মাঠে নামবার আগেই ব্রাজিল একটি গোল দিয়ে এগিয়ে গেল। সারাটা খেলায় মিতিক নিজেকে বাঁচিয়ে খেলার জন্য যুগোশ্লাভ দলের পক্ষে কোনোরকম আক্রমণ গড়া সম্ভব হলো না। তারা আত্মরক্ষায় অতিমাত্রায় ব্যস্ত হওয়ার ফলে ব্রাজিল দ্বিতীয় গোলটি দিয়ে অতি সহজে ব্যবধান বাড়িয়ে নিলো। ম্যাচের আগে যা আশা করা

গিয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত হলো না। একরকম উত্তেজনাহীনভাবে একপেশে ফুটবল খেলে ক বিভাগের শীর্ষস্থান পেলো ব্রাজিল। দ্বিতীয় স্থানটি পেলো যুগোশ্লাভিয়া।

খ বিভাগে দুরন্ত ফুটবল খেললো স্পেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা প্রথম ম্যাচে শুধু ৩—১ গোলে জয় পেলো না, তারা জয় পেলো গ্রুপ লীগের অন্য দুটি খেলাতেও। স্পেনের কাছে চিলি হারলো ২—০ গোলে, ইংল্যাণ্ড ১—০ গোলে। এই গ্রুপের অন্য খেলায় আমেরিকা অপ্রত্যাশিতভাবে জয় পেয়ে গেল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। চিলি গ্রুপ লীগের দুটি খেলাতে হারলেও জয় পেলো আমেরিকার বিরুদ্ধে। এই জয় তারা পেলো ৫—০ গোলে। ফলে খ বিভাগ থেকে শীর্ষস্থান পেয়ে ফাইনাল পর্যায়ে উঠলো স্পেন।

গ বিভাগে সেরা দল নির্বাচিত হলো সুইডেন। এই বিভাগ থেকে ইতালি ফাইনাল রাউণ্ডে যাবে এই বিশ্বাস ছিল অনেকের। কিন্তু বিগত দুবারের চ্যাম্পিয়ান ইতালি ব্রাজিলে খেলতে এসে খুব একটা সুবিধে করতে পারলো না। তাদের দল আগের মতো ছিল না। ছিল না পেজোর মতো কোচ। যুদ্ধের পর তারা যেন একেবারে নতুন একটি দলে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথম ম্যাচেই সুইডেন তাদের থমকে দিল। এই ম্যাচে ইতালি জয়ের জন্য খেলা শুরু করেও শেষ রক্ষা করতে পারলো না। ২—০ গোলে জিতে গেল সুইডেন। এই পরাজয় তাদের ফাইনাল পর্বে ওঠার স্বপ্ন নষ্ট করে দিল। শেষ ম্যাচে তারা প্যারাগুয়েকে ২—০ গোলে হারালেও এই জয় তাদের কোনোরকম আশার সঞ্চার করতে পারলো না। এই গ্রুপে বিস্ময় আনলো প্যারাগুয়ে। তারা ইতালির কাছে ম্যাচ হারলেও রুখে দিল দুর্ধর্ষ সুইডেন দলকে। সুইডেনকে এই ম্যাচে আপ্রাণ লড়াই করতে হয়েছিল কেবলমাত্র ম্যাচটিকে অমীমাংসিতভাবে ধরে রাখার জন্য। কোনোক্রমে ২—২ গোলে ম্যাচ শেষ করার সুবাদে গ্রুপ লীগে শীর্ষস্থান পেলো সুইডেন।

ঘ বিভাগের একটি মাত্র খেলায় উরুগুয়ে বলভিয়ার মতো একটি দুর্বল দলকে অনায়াসে ৮টি গোল দিয়ে পেলো শীর্ষস্থান। ফলে টুর্ণামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে চারটি বিভাগের চারটি শীর্ষ দল পেলো

ফাইনাল পুলে খেলার সুযোগ। লীগ শেষে চারটি দলের ফলাফল ছিল এইরূপ ঃ—

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ব্রাজিল (ক বিভাগ)	৩	২	×	১	৮	২	৫
স্পেন (খ বিভাগ)	৩	৩	০	০	৬	১	৬
সুইডেন (গ বিভাগ)	২	১	১	০	৫	৪	৩
উরুগুয়ে (ঘ বিভাগ)	১	১	০	০	৮	০	২

প্রথম পর্যায়ের খেলা শেষ হওয়া মাত্র গবেষকের দল বিচার বিশ্লেষণ করতে বসলেন। তাঁরা প্রাথমিক লীগের খেলাগুলির তাৎপর্য বিচার করে বললেন, এবারের বিশ্বকাপ ইউরোপে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। যদিও স্পেন প্রাথমিক লীগে অপরাজেয় তবু তাদের নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। বরং ফাইনাল পর্বে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার জন্য জোরদার লড়াই হবে ল্যাটিন-আমেরিকার দুটি দেশ—ব্রাজিল ও উরুগুয়ের মধ্যে।

হলোও তাই।

ফাইনাল পর্বে প্রথম খেলায় মাঠে নেমে ব্রাজিলের খেলোয়াড়েরা সুইডিসদের নিয়ে ছেলেখেলা করলো। এইদিন এক ডজন গোল হলেও কারো কিছু বলার থাকতো না। সুইডেন ৭—১ গোলে হার স্বীকার করতে বাধ্য হলো। অন্যদিকে প্রচণ্ড লড়াই হলো উরুগুয়ের সঙ্গে স্পেনের। যদিও মরণ শপথ নিয়ে মাঠে নেমেছিল স্প্যানিশ ফুটবলারেরা, তবু তারা কোনোরকম বড়ো ধরনের চমক সৃষ্টি করতে পারলো না। আক্রমণভাগের দুর্বলতার জন্য তারা গোলের সুযোগ ঠিক মতো তৈরী করতে না পারায় খেলাটি আগাগোড়া হলো স্প্যানিশ দলের রক্ষণ সীমানার মধ্যে। উরুগুয়ে এই ম্যাচ জিতলো ৩—২ গোলে।

রিওতে ব্রাজিল আবার বড়োসড়ো ব্যবধানে জয় পেলো স্পেনের সঙ্গে। এইদিন তাদের জিৎ হলো ৬—১ গোলে। ব্রাজিলের দলবদ্ধ ফুটবল সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিলো। তাদের খেলার ধরন দেখে পণ্ডিতের দল মোহিত হলেন। এই ম্যাচে চমৎকার ফুটবল খেললেন চিকো ও জেয়ার।

সালপাওলোর স্টেডিয়ামে সুইডেন তাদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামলো

উরুগুয়ের সঙ্গে। সুইডিশ দলটির এমন কোনো ক্ষমতা ছিল না যার ওপর নির্ভর করে তারা উরুগুয়েকে রুখে দেওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে। বরং মাঠে নামার আগেই তারা মানসিকভাবে হার স্বীকার করে বসেছিল। ফলে কোনো রকম শ্রম না করেই উরুগুয়ে ম্যাচ জিতে গেল ৩—১ গোলে।

ফাইনাল পর্বের চূড়ান্ত লড়াই হলো ব্রাজিল বনাম উরুগুয়ের মধ্যে।

এই ম্যাচটিকে ঘিরে উত্তেজনার শেষ ছিল না। ফাইনাল পুলে এই ম্যাচ ছিল ভাগ্য নির্ধারণের ম্যাচ। লীগ পর্যায়ের খেলায় দুটি দলই তখন সমান পয়েন্টের অধিকারী। অতএব এই খেলায় যে দল জিতবে, তারাই হবে চ্যাম্পিয়ান।

স্বদেশের মাঠে ব্রাজিল বিশ্বকাপ জয়ের জন্য কোমর বেঁধে নামলো। তাদের পিছনে ছিল ব্যাপক জনসমর্থন। সবচেয়ে বড় কথা হলো তাদের বিরুদ্ধে যে দলটি খেলছে, সেই দলটি হলো তাদের চির-প্রতিদ্বন্দ্বী। ম্যাচের আগে উত্তেজনায় উরুগুয়ে দলটি ভয়ে যেন কুঁকড়ে ছিল। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তারা একবারও মুখ ফুটে বলতে পারলো না যে এই ম্যাচে তারা জিততে পারে। বরং ভাব দেখে মনে হলো তারা যেন ব্রাজিলকে মাঠে না নেমেই ম্যাচটি ছেড়ে দিতে চায়। আত্মবিশ্বাসী ব্রাজিল খেলোয়াড়দের মনে স্ফূর্তি ছিল। তারা চ্যাম্পিয়ান হয়ে গেছে এটা ধরে নিয়েই শিষ দিয়ে ছুটি কাটাবার মেজাজে ঘোরাফেরা করতে লাগলো।

ম্যাচের দিন সকালে উরুগুয়ে থেকে বেশ কয়েক হাজার সমর্থক এলো ব্রাজিলে। তাদের মুখে উরুগুয়ের শ্লোগান। দলীয় সমর্থকদের পাশে পেয়ে উরুগুয়ে খেলোয়াড়েরা যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তারা নিজেদের জাতীয় পতাকা স্পর্শ করে শপথ নিলো, আজকের ম্যাচে তাদের জিততেই হবে। প্রথম বছর ফাইনালে উঠে তারা স্বদেশের মাঠে জয় পেয়েছিল। তাদের সেই জয় নিয়ে সন্দেহ ছিল অনেকের। এবার সেই অবজ্ঞা, অবহেলাকে মুছে ফেলতে হবে। বিশ্বের নাক-উঁচু বিজ্ঞদের বুঝিয়ে দিতে হবে ফুটবলে তারা এখনও সেরা।

মারকানা স্টেডিয়ামে সেদিন যেন উত্তেজনার ঝড় বয়ে গেল। দুই দলই মরিয়া। অসাধারণ ফুটবল খেললেন তিন খেলোয়াড়—জিজিনো, আমেদীর

ও জেয়ার। আক্রমণের পর আক্রমণ তাঁরা শানাতে লাগলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ব্রাজিলের, প্রতিটি সুযোগ অল্পের জন্য তাদের হাতছাড়া হলো। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ভাবে শেষ হলো। গোল প্রথম এলো দ্বিতীয়ার্ধের ১৮ মিনিটের মাথায়। চিকো মারফত বল পেলেন জিজিনো। তাঁর পা ছুঁয়ে বল এলো জেয়ারের কাছে। জেয়ার বল বাড়ালেন ফ্রিয়াকাকে। ডান পায়ের জোরালো শট—মাসপোলি পারলেন না সেই বলকে আয়ত্বে রাখতে। প্রথম গোল পেয়ে এগিয়ে গেল ব্রাজিল। কিন্তু এই ব্যবধান তারা বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারলো না। দশ মিনিট যেতে না যেতে গোল শোধ করলেন শিয়াফিনো। এরপর খেলা চললো ঝড়ের গতিতে। শেষ মুহূর্তে চমৎকার বোঝাপড়ার মধ্যে একটি আকর্ষিক মুভ তৈরী করে দর্শনীয় গোল দিলেন উরুগুয়ের কুশলী ফরোয়ার্ড ঘিঘিয়া। তাঁর ডান পায়ের টোকায় বল গোলে প্রবেশ করা মাত্র চতুর্থ বিশ্বকাপের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। ২—১ গোলে জয় পেয়ে গেল উরুগুয়ে। এই জয়ের সুবাদেই তারা অপরাজিত অবস্থায় হলো পঞ্চাশ সালের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান।

ফাইনাল লীগে চূড়ান্ত পর্যায়ে ফলাফল দাঁড়ালো যথাক্রমে ঃ—

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
উরুগুয়ে—	৩	২	০	১	৭	৫	৫
ব্রাজিল—	৩	২	১	০	১৪	৪	৪
সুইডেন—	৩	১	২	০	৬	১১	২
স্পেন—	৩	০	২	১	৪	১১	১

বলা বাহুল্য সেদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিল ১,৯৯,৮৫০ জন দর্শক। এই আসরে সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছিলেন ব্রাজিলের আমেদীর। তিনি সাতটি গোল দিয়ে পেয়েছিলেন সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান।

ব্রাজিলের দুর্ভাগ্য, তারা এত চেষ্টা সত্বেও পারলো না বিশ্বকাপকে স্বদেশের মাটিতে নিজেদের ঘরে তুলতে। এই সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় তারা কিন্তু হতাশ হলো না। বরং আগামী বিশ্বকাপের জন্য তারা নব উদ্যমে তৈরী হলো। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, পঞ্চাশের আসর শেষ হওয়া

মাত্র ঠিক হয়ে গেল আগামী চুয়ান্ন সালের বিশ্বকাপ আসরটি অনুষ্ঠিত হবে সুইজারল্যাণ্ডে।

বিশ্বের বিস্ময় পশ্চিম জার্মানী (১৯৫৪)

১৯৫৪ সাল।

সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বকাপ আসর। সমগ্র ইউরোপ এতোদিনে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পরিস্থিতি বেশ কিছুটা সামলে নিয়েছে। অর্থনৈতিক কাঠামোকে জোরদার করতে আবার সকলে তৎপর হয়ে উঠেছে কর্মব্যস্ততায়। এই অবস্থায় সুইজারল্যাণ্ডকে ঘিরে পড়ে গেল সাজ সাজ রব। বিশ্ব ফুটবলে নতুন ধারা নিয়ে এই সময় আত্মপ্রকাশ করেছে হাঙ্গেরী। পঞ্চাশ দশকের শুরুতেই ঘটেছে তাদের শুভ আবির্ভাব। ১৯৫২ সালে বিশ্বের সেরা দেশগুলিকে পদানত করে হাঙ্গেরী জয় করেছে ওলিম্পিকের স্বর্ণপদক। এই জয় হাঙ্গেরীয়ানদের মনোবল ও বাসনাকে আরও সুদূরপ্রসারী করে তুলেছিল। তাদের লক্ষ ছিল বিশ্বকাপ জয়।

হাঙ্গেরীর অভ্যুত্থান মুহূর্তে ইউরোপের দেশগুলি অনেকেই তখন গুটিয়েছিল। ইতালি, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া দলের আগের মতো সেই তেজ ও শক্তি ছিল না। ফলে হাঙ্গেরীকে দাবিয়ে রাখার মতো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখা যায় নি। পঞ্চাশ দশকের গোড়া থেকে তাই হাঙ্গেরী একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ে ফুটবল খেলেছে। তাদের দলে ছিলেন গ্রোসিস, পুসকাস, হিদিকুটি, বোজসিকের মতো প্রতিভাবান ফুটবলারেরা। প্রতিভায় এরা কেউ কারো চেয়ে খাটো ছিলেন না। বরং ওদের দলগত ঐক্য ও সংহতি দেখে মনে হতো ওরা যেন পরস্পর পরস্পরের জন্যই তৈরী হয়ে মাঠে নেমেছে। তাদের নয়া ফুটবল কৌশল দেখে বিশ্বের মানুষ হলো বিস্মিত।

হাঙ্গেরীর এই জয়জয়কারের মূলে যে মানুষটির নাম সর্বাগ্রে করতে হয় তিনি হলেন গুস্তাফ সেবেস। সেবেস নিজে একজন বড় ফুটবলার না হলেও, তিনি ছিলেন একজন সেরা ফুটবল শিক্ষক। তাঁর হাতেই তৈরী হয়েছিলেন পুসকাস, বোজসিক ও হিদিকুটির মতো প্রতিভাধরেরা।

বাহান্ন সালে ওলিম্পিকের আসর মাতিয়ে তোলার পর হাঙ্গেরীকে নিয়ে শুরু হয়েছিল বিশ্বময় তোলপাড়। বিশ্বকাপ আসরে তাদের যে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না এটা সবাই জানতেন। আর জানতেন বলেই সবাই একবাক্যে বলেছিলেন—'হাঙ্গেরী হলো আসন্ন বিশ্বকাপের একটা নিশ্চিত চ্যাম্পিয়ান দল।'

বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মাস আগে এই হাঙ্গেরী দলটির হাতেই শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল নাকউঁচু ইংল্যাণ্ড দল। ছুটি ম্যাচে হাঙ্গেরী জয় পেয়েছিল যথাক্রমে ৬—৩ ও ৭—১ গোলে। হাঙ্গেরীর এই জয় তাদের সাফল্য সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে আরও সচেতন করে দিয়েছিল।

প্রথমটায় ঠিক ছিল হাঙ্গেরী দলটিকে লড়াই করতে হবে পোল্যাণ্ড দলের সঙ্গে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পোল্যাণ্ড ক্র্যাচড হওয়ায় হাঙ্গেরীকে মোকাবিলা করতে হলো পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে। যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম জার্মানী তখন নতুন ছেলেদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। তারা যে হাঙ্গেরী দলটির সঙ্গে স্বাভাবিক কারণে পেরে উঠবে না এই ধারণাই ছিল সকলের। হলোও তাই। গ্রুপ লীগের প্রথম খেলায় ছুর্ধর্ষ হাঙ্গেরীয়ানরা জার্মানী দলটিকে নিয়ে একরকম ছেলেখেলা করলো। এইদিন তারা ইচ্ছে করলে যে কতগুলি গোল জার্মানীদের দিতে পারতো তার হিসাব করা ছিল শক্ত। কিন্তু গুস্তাফের নির্দেশে আটটি গোল দিয়ে ম্যাচটিকে তারা কোনোরকমে শেষ করলো। এই ম্যাচে পুসকাস তাঁর স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেন নি। তাঁকে ফাঁসে ফেলে যথেষ্ট মারধোর করলো জার্মান ডিফেনডারেরা। ফলে তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়লেন। গ্রুপ লীগের অন্য একটি খেলায় হাঙ্গেরী আগেই জয় পেয়েছিল কোরিয়ার বিরুদ্ধে ৯—০ গোলে। ফলে প্রাথমিক লীগের ছুটি ম্যাচে ১৭টি গোল দিয়ে তারা পেলো খ বিভাগে শীর্ষস্থান।

বলা বাহুল্য এই আসরে বিশ্বকাপ কমিটি বেশ কিছু হাস্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। মোট ষোলোটি দেশকে তাঁরা চারটি করে দলে ভাগ করে-ছিলেন। সেই সঙ্গে ঠিক হয়েছিল প্রতি গ্রুপে থাকবে ছুটি করে বাছাই দল। এই পদ্ধতিতে ফুটবল খেলে মোট আটটি দল উঠে এলো কোয়ার্টার

ফাইনালে। এই আটটি দল হলো যথাক্রমে ব্রাজিল, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, পশ্চিম জার্মানী, উরুগুয়ে, অষ্ট্রিয়া, ইংল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড।

কোয়ার্টার ফাইনালের একটি সেরা খেলা অনুষ্ঠিত হলো বারণে। এই মাঠে পুসকাসহীন হাঙ্গেরী দলকে দুরন্ত লড়াই করতে হলো ব্রাজিলের সঙ্গে। এই ম্যাচের রক্তাক্ত চেহারা দেখে শিউরে উঠলো দর্শকেরা। মাঠের মধ্যেই হলো ধস্তাধস্তি, হাতাহাতি। প্রথন দশ মিনিটের মধ্যেই দু-দুটি গোল দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল হাঙ্গেরী। গোল খেয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিল ব্রাজিল। শুরু হলো রক্তাক্ত ফুটবল। মাঠ থেকে বার করে দেওয়া হলো বোজসিক ও স্যাণ্টোসকে। ৪—২ গোলে হাঙ্গেরী ম্যাচ জিতলেও, মাঠের রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল ড্রেসিং রুমে। খেলোয়াড়েরা পরস্পরের মধ্যে বোতল ছোড়াছুড়ি করলেন। কাগজে কাগজে ফলাও করে এই ম্যাচের দাঙ্গার খবর ছাপা হলো। বিতর্কিত নায়ক হিসাবে ঘটনায় জড়িয়ে পড়লেন ফেরাঙ্গ পুসকাস।

জেনিভায় একমাত্র ভাগ্যের প্রসন্নতায় ২—০ গোলে জয় পেলো পশ্চিম জার্মানী। এই ম্যাচে তাদের জেতার কোনো কারণ ছিল না। ঝুড়ি ঝুড়ি গোলের সুযোগ অপচয় করায় যুগোশ্লাভ দলকে হার স্বীকার করতে হলো। লুসানে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বীতার পর অষ্ট্রিয়া ৭—৫ গোলে জয় পেলো সুইজারল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে। ব্রাসেলে ইংল্যাণ্ডকে ৪—২ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠে এলো উরুগুয়ে।

সেমি-ফাইনালে হাঙ্গেরীকে আবার একটি শক্ত ম্যাচ খেলতে হলো উরুগুয়ে দলের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে হাঙ্গেরী যতটা নিশ্চিন্ত ছিল ঠিক ততোটা অনিশ্চিত অবস্থায় পড়লো ম্যাচ শুরু হওয়ার পর। দেওয়ালে পীঠ দিয়ে যুদ্ধ না করে উরুগুয়ে প্রথম থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো হাঙ্গেরী দলটির ওপর। তাদের হারাবার কিছু নেই অতএব লড়াই করতে দোষটা কোথায়? উরুগুয়ের দ্রুত আক্রমণ মুহূর্তের জন্য হাঙ্গেরীকে থমকে দিলেও তাদের বেঁধে রাখতে পারলো না। শুরু হলো পালটা আক্রমণ। প্রথম গোল এলো জীবরের পা থেকে। এই গোলটি পাওয়ার পরই হাঙ্গেরী দল আবার চেপে ধরলো। এবার গোল দিলেন কোজিস। দু-দুটো গোল হজম করতে হলো উরুগুয়ে দলটিকে। এবার তারা প্রাথমিক ধাক্কা সামলে

আক্রমণে ফিরে এলো। চোখের নিমেষে তারা শোধ করলো দুটি গোল। খেলার ফলাফল ২—২ দাঁড়াতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো মাঠে। দুই দলই তখন জেতার জন্য মরিয়া। এই সময় আন্দ্রাদে আহত হয়ে মাঠ ছাড়লেন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কসুর করলো না হাঙ্গেরী ফরোয়ার্ডরা। কোজিসের চমৎকার হেড তৃতীয় গোল এনে দিল। চতুর্থ গোলটি দিলেন রিদিকুটি। শেষ পর্যন্ত ৪—২ ফলাফল নিয়ে ম্যাচ শেষ হলো। ফাইনালে উঠে এলো হাঙ্গেরী। এই নিয়ে তারা দ্বিতীয়বার ফাইনালে উঠলো। অন্যদিকে সাদা-মাটা পশ্চিম জার্মানী দলটি অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিল। কে বলবে এই দলটি প্রাথমিক লীগে আট গোল খেয়েছিল হাঙ্গেরীর কাছে। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তারা যে এতো সহজে জয় পাবে এমনটি কেউ আশা করে নি। এই ম্যাচে জার্মানী খেলোয়াড়েরা দুরন্ত ফুটবলের পরিচয় দিয়ে জয় পেয়ে গেল ৬—১ গোলে। ফলে ফাইনালে মুখোমুখি হলো হাঙ্গেরী ও পশ্চিম জার্মানী।

৪ঠা জুলাই বারণে অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহাসিক ফাইনাল। এই ম্যাচকে ঘিরে কোনোরকম উত্তেজনাই ছিল না। কারণ যে জার্মান দলটি হাঙ্গেরীর হাতে প্রাথমিক লীগে শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে ফাইনালটি আর কতো ভালো হবে। সকলেই ধরে নিলেন ফাইনালে হাঙ্গেরী লিখিত-ভাবে জয় পাচ্ছে। এই ব্যাপারে সেবেস গুস্তাফ মন্তব্যের ক্ষেত্রে আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন—'জুলেরিমে আমরা হাঙ্গেরীতে নিয়ে যাচ্ছি! এই সুদৃশ্য কাপটি কোথায় রাখা হবে সেই জায়গাও আমাদের ঠিক করা হয়ে গেছে। এখন আমরা অপেক্ষা করছি খাতাকলমে কাপটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হাতে পাওয়ার জন্য।'

তবু কোনো কোনো গবেষক জার্মানীর পরবর্তী খেলাগুলোকে পর্যালোচনা করে বললেন—'পশ্চিম জার্মানী যদি ফাইনালে বিস্ময়কর কিছু করে তাতে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ তারা এবারের আসরে শেষদিকের প্রতিটি ম্যাচে অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে।'

ফাইনালের আগে বাতাস গরম হয়ে উঠলো বিতর্কিত পুসকাসকে নিয়ে। প্রশ্ন একটাই—পুসকাস কি ফাইনালে খেলবেন? তাঁর না খেলারই কথা।

প্রাথমিক লীগে পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে সেই যে তিনি আহত হয়েছিলেন, তারপর থেকে একটি ম্যাচেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন নি। কাজেই পুসকাসকে ঘিরে প্রশ্ন ছিল। প্রথমে শোনা গিয়েছিল তিনি ফাইনালে মাঠে নামবেন না। পরে আবার শোনা গেল তিনি খেলছেন। পুসকাস না খেলার প্রশ্নে পশ্চিম জার্মানীর তরফ থেকে বলা হলো—যদি পুসকাস ফাইনালে না খেলেন, তাহলে হাঙ্গেরীকে যথেষ্ট বিপদের মধ্যে পড়তে হবে। তবে পুসকাস খেললে পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে যথেষ্ট চিন্তা থাকবে।

খেলার দিন সকাল থেকে উত্তেজনা বাড়লো। যে পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে কোনো বাজির দর ছিল না, সেই তাদের পক্ষে অনেকেই বাজি ধরলেন।

আকাশে সেদিন মেঘ ছিল প্রচুর। খানিক বাদে শুরু হলো বৃষ্টি। পুসকাসের নেতৃত্বে মাঠে নামলো হাঙ্গেরী। পুসকাসকে মাঠে দেখে সবাই খুশী। কিক-অফের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বাড়তে লাগলো। ঝড়ের বেগে খেলা শুরু করে দিল হাঙ্গেরী। মাত্র ৬ মিনিটের মধ্যে দাপটের সঙ্গে ফুটবল খেলে ২—০ গোলে এগিয়ে গেল হাঙ্গেরী। খেলার ধরন দেখে মনে হলো ফলাফল হয়তো প্রাথমিক লীগ ম্যাচের মতো দাঁড়াবে। গোটা জার্মান দলটি গুটিয়ে আছে। গোল পাওয়ার তাদের কোনো আশা নেই। আত্মবিশ্বাসী হাঙ্গেরীয়ানরা যখন মাঠ জুড়ে খেলছেন ঠিক তখনই একটা অর্ধেক সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গোল করে বসলেন রান। হঠাৎ গোল খেয়ে হাঙ্গেরী খেলোয়াড়েরা বিস্মিত হলেন। এই বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই আবার গোল পেয়ে গেল পশ্চিম জার্মানী। ফলাফল দাঁড়ালো ২—২।

বিরতির পর খেলা চললো দ্রুত লয়ে। কেউ কারো চেয়ে কম নয়। এইদিন জার্মান দলটি নিজেদের সমস্ত ক্ষমতাকে উজাড় করে দিতে কসুর করলো না। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে খেলা চলছিল। তারই ফাঁকে হঠাৎ বোজসিকের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে ফাঁকায় জার্মানীর পক্ষে তৃতীয় গোলটি করে এলেন রান। এই গোলের ফলে ব্যবধান বেড়ে গেল। পিছিয়ে পড়া হাঙ্গেরী এবার আহত সিংহের মতো গর্জে উঠলো। গোল শোধ করার জন্য তারা হলো মরিয়া। জার্মান খেলোয়াড়েরা আক্রমণ ঠেকাতে সবাই নেমে এলো।

খেলার অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। তবে কি প্রত্যাশিত হাঙ্গেরীকে ব্যর্থ হতে হবে ? একেবারে শেষ মুহূর্তে পুসকাস বল পেয়ে মরিয়া হয়ে গোলে শট নিলেন। বল জড়িয়ে গেল জালে। চীৎকার করে উঠলেন সকলে। অথচ আশ্চর্য, রেফারি অফ-সাইডের অজুহাতে বাতিল করে দিলেন পুসকাসের এই গোলটি।

বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন হাঙ্গেরীর খেলোয়াড়েরা। রেফারি কর্ণপাত করলেন না। ফলে ৩—২ গোলের ব্যবধানে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দ্বিতীয়বার হারাতে হলো হাঙ্গেরীকে। ফুটবলে বিস্ময়কর নজির সৃষ্টি করে পশ্চিম জার্মানী জয় করলো বিশ্বকাপ। তাদের এই জয় আধুনিক দুনিয়াকে বুঝিয়ে দিল, শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে বশে আনতে হলে সবার আগে প্রয়োজন দলগত ঐক্য ও স্ট্যামিনা। এই স্ট্যামিনা হলো আধুনিক ফুটবলের হাতিয়ার। বলা বাহুল্য এই আসরে এগারোটি গোল দিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেলেন হাঙ্গেরীর কোজিস। সমস্ত উত্তেজনা শেষ করে সুইজারল্যাণ্ডের আসর শেষ হলো। সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত হলো পরবর্তী আসর অনুষ্ঠিত হবে সুইডেনে।

ব্রাজিলের স্বপ্ন সফল হলো : (১৯৫৮)

সুইডেনের বিশ্বকাপ নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আসরে কোন দল ফেবারিট, এই ব্যাপারে কোনো বিশেষজ্ঞ আগে-ভাগে মন্তব্য করতে রাজি হলেন না। গতবারের আসরে তাঁরা মন্তব্য করে আচ্ছা ঠকান ঠকেছেন, অতএব কি দরকার মন্তব্যের মধ্যে যাওয়ার। শেষে হয়ত নিজেদের ছোড়া থুথু নিজেদেরই গিলতে হতে পারে।

সুইডেনের আসরে বিশ্বের দুটি সেরা দেশের পরাজয় বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়েছিল। ইতালি ও উরুগুয়ে দলকে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ আসর থেকে প্রথমেই ছিটকে যেতে হলো। যে উরুগুয়ে ও ইতালি দু-দুবারের চ্যাম্পিয়ান সেই তাদের হার স্বীকার করতে হলো প্যারাগুয়ে ও আয়ারল্যাণ্ড দলের কাছে। উরুগুয়েকে ৫—০ গোলে বিধ্বস্ত করে প্যারাগুয়ে চমকে দিল

সকলকে। নবাগত আয়ারল্যাণ্ড দলের কাছে ২—১ গোলে হার হলো ইতালির। সুইডেনের আসরে উপস্থিত ছিল মোট ষোলোটি দেশ। এই ষোলোটি দেশকে চারটি বিভাগে ভাগ করা হলো। প্রতি বিভাগে থাকলো চারটি করে দল।

প্রাথমিক লীগ শুরু হতেই অঘটন ঘটতে শুরু করলো। ক বিভাগে চেকোশ্লাভাকিয়াকে হারতে হলো আয়ারল্যাণ্ডের কাছে। পরের ম্যাচে আয়ারল্যাণ্ড আবার রুখে দিল গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ান জার্মানীকে। প্রচণ্ড লড়াই করার পর ২—২ গোলে ম্যাচকে অমীমাংসিত রাখতে বাধ্য হলো জার্মানী। আবার দেখা গেল যে আর্জেন্টিনা অনায়াসে আয়ার-ল্যাণ্ডকে হারিয়েছে, তারাই আবার হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে চেক দলের কাছে।

খ বিভাগে ফ্রান্স খেলা শুরু করলো দাপটের সঙ্গে। প্রথম ম্যাচেই তারা শোচনীয়ভাবে হারালো প্যারাগুয়ে দলটিকে। ফ্রান্স জয় পেলো ৭—৩ গোলে। প্রথম ম্যাচেই দৃষ্টি কেড়ে নিলেন ফনটাইন। তিনি দিলেন তিনটি গোল। আবার দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্ধর্ষ ফ্রান্স অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে বসলো যুগোশ্লাভ দলের কাছে। ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হলো ৩—২ গোলে। ফ্রান্সের পক্ষে একমাত্র ফনটাইনকে ছাড়া আর কাউকেই মাঠের মধ্যে নড়াচড়া করতে দেখা গেল না। স্কটল্যাণ্ড যুগোশ্লাভের ম্যাচটি শেষ হলো ১—১ গোলে। অথচ আশ্চর্য যে স্কটল্যাণ্ড যুগোশ্লাভের মতো একটি শক্তিশালী দলকে রুখে দিল, সেই তারাই আবার হেরে বসলো প্যারাগুয়ের কাছে। শেষ ম্যাচে প্যারাগুয়ে আরও উন্নত ফুটবলের পরিচয় দিয়ে যুগোশ্লাভকে ম্যাচ ড্র রাখতে বাধ্য করলো।

গ বিভাগে বড় ধরনের অঘটন ঘটালো ওয়েলস দল। তারা প্রথম ম্যাচেই পঞ্চাশের সেরা হাঙ্গেরীকে রুখে দিল। দুরন্ত লড়াই করার পর ম্যাচ শেষ হলো ১—১ গোলে। নবাগত ওয়েলস পরের দুটি ম্যাচও অমীমাংসিত রাখলো। এই বিভাগে তিনটি ম্যাচের মধ্যে একমাত্র দুটি ম্যাচে জয়ের মুখ দেখতে পেলো সুইডেন। একমাত্র তারা ওয়েলসের সঙ্গেই ম্যাচ অমীমাংসিত রেখেছিল।

ঘ বিভাগে চমৎকার ফুটবলের পরিচয় দিল ব্রাজিল। তারা তিনটি খেলায় পাঁচটি গোল দিয়ে বিভাগীয় লীগে গেল শীর্ষে।

প্রাথমিক পর্বের খেলা শেষ করে শুরু হলো কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা। চারটি বিভাগের প্রথম তুটি করে দল নিয়ে এই পর্যায়ের খেলা শুরু হলো। এই আটটি দেশ ছিল যথাক্রমে জার্মানী, চেকোশ্লাভিয়া, ব্রাজিল, ফ্রান্স, সুইডেন, ওয়েলস, যুগোশ্লাভিয়া ও রাশিয়া।

তু-একদিন বাদেই শুরু হলো কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা। শক্তিশালী ফ্রান্সকে মুখোমুখি হতে হলো আয়ারল্যাণ্ড দলের সঙ্গে। এই ম্যাচে আয়ারল্যাণ্ড দল তাদের প্রাধান্যকে ধরে রাখতে পারলো না। ফরাসী আক্রমণের সামনে তারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলো। ৪—০ গোলে ফ্রান্স জয় পেয়ে উঠে এলো সেমি-ফাইনালে।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে বেশ কষ্ট করে ম্যাচ জিততে হলো সুইডেন দলকে। ওয়েলসের সঙ্গে ব্রাজিলের খেলাটি শেষ হলো উত্তেজনার মধ্যে। এই ম্যাচে ব্রাজিলের হয়ে মাঠে নামলেন তুই নবাগত তরুণ ফুটবলার—পেলে ও গ্যারিঞ্চা। এই তুই তরুণ খেলোয়াড়ের দক্ষতার জন্য ব্রাজিল মাত্র ১—০ গোলে জয় পেলো। গোল দিলেন নবাগত পেলে। বলা বাহুল্য এটাই ছিল পেলে ও গ্যারিঞ্চার প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা।

উপভোগ্য হলো পশ্চিম জার্মানী বনাম যুগোশ্লাভিয়ার ম্যাচটি। তুই দলই কঠিন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে মাঠে নেমেছিল। কেউ হার স্বীকার করতে রাজি ছিল না। কিন্তু স্ট্যামিনার প্রতীক পশ্চিম জার্মানীকে শেষ মুহূর্তে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। চকিত আক্রমণে গোল পেয়ে গেল পশ্চিম জার্মানী। গোল দিলেন সুযোগ সন্ধানী রান।

সেমি-ফাইনালের খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে মিলিত হতে হলো সুইডেনের সঙ্গে। অন্যদিকে স্টকহোমে ব্রাজিল পড়লো ফ্রান্সের সামনে।

নিজেদের চেনা মাঠে সুইডেনের খেলোয়াড়েরা মরণ পণ করে ফুটবল যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। তাদের পিছনে ছিল ব্যাপক জন সমর্থন। আগের দিন বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। সুইডেন প্রথম থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে কোণঠাসা করে ফেললো পশ্চিম জার্মানীকে।

অথচ এই অবস্থার মধ্যে জার্মান দল আকস্মিক আক্রমণ শাণিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি গোল পেয়ে এগিয়ে গেল। গোল দিলেন হান্স। এই গোল হওয়ার পরই সুইডেন দল মরিয়া হয়ে উঠলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তারা একটি গোল দিয়ে খেলায় সমতা আনলো। এর পর ঝড়ের বেগে চললো খেলা। শেষ পর্যন্ত সুইডেন দল জয় পেল ৩—১ গোলে। এই জয় তাদের তুলে আনলো ফাইনালে। অন্যদিক থেকে ফাইনালে উঠে এলো ব্রাজিল। দীর্ঘদিন বাদে তাদের স্বপ্ন সফল হলো। সেমি-ফাইনালে তারা ফ্রান্সকে শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত করলো ৫—২ গোলে। এই ম্যাচে পেলে দিলেন ৩টি গোল এবং একটি করে গোল দিলেন ডিডি ও ভাভা।

২৯শে জুন স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হলো ফাইনাল। এই ম্যাচ দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন ৫০,০০০ হাজার দর্শক। ফাইনালের দিন সকাল থেকে শুরু হলো বৃষ্টি। ভিজে মাঠে সুইডিশ দলকে ব্রাজিলিয়ানরা দাঁড়াতেই দিল না। অনবদ্য ফুটবলের পরিচয় দিলেন ডিডি, ভাভা, গ্যারিঞ্চা ও পেলে। এই ম্যাচেই একটি অবিশ্বাস্য গোল দিয়েছিলেন পেলে। ম্যাচের ফলাফল হলো ৫—২। এই জয়ের ফলে ব্রাজিল প্রতিষ্ঠা পেলো বিশ্বচ্যাম্পিয়ানের মর্যাদায়। বহুদিনের স্বপ্ন তাদের সার্থক হলো। নবাগত পেলে ও গ্যারিঞ্চাকে নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেল চারিদিকে। মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলে চলতি বিশ্বকাপ আসরে পেলে দিলেন ৬টি গোল। এই বছর সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেলেন ফ্রান্স দলের ফনটাইন। তিনি দিলেন মোট ১৩টি গোল। বলা বাহুল্য সর্বোচ্চ গোলদাতার এই রেকর্ডটি বিশ্বকাপ ফুটবলে আজও কারো পক্ষে ভাঙ্গা সম্ভব হয় নি।

সুইডেনের আসর শেষ করে এবার আমরা প্রবেশ করবো চিলির বিশ্বকাপে। ল্যাটিন-আমেরিকার মাঠে আবার অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বকাপের খেলা।

চিলিতে আবার ব্রাজিল জিতলো : (১৯৬২)

চিলিতে বিশ্বকাপ আসর বসা নিয়ে সদস্য দেশগুলির মধ্যে অনেকেরই

যথেষ্ট আপত্তি ছিল। এর কারণ চিলিতে কয়েকদিন আগে ঘটে গেছে ভয়াবহ ভূমিকম্প। এর ফলে গোটা চিলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যরা বললেন—'যে দেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে এমন শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হয়, সেই দেশের কি এতোবড়ো কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব ?' কিন্তু চিলির আন্তরিক আবেদনকে শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারলেন না ফিফার কর্তারা। চিলির ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কার্লস ডিটবর্ণ বললেন—'ভয়াবহ ভূমিকম্পের কবলে পড়ে চিলির অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে চুরে গেছে। এই অবস্থায় মানুষের মধ্যে নতুন করে বাঁচার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে বিশ্বকাপের দায়িত্ব আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। এই দায়িত্ব নেওয়া কেবল একটা দেশের মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা।'

চিলির এই আবেদনে তাই সাড়া দিলেন কর্তারা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো মাত্র অল্প সময়ের মধ্যে চিলি দায়িত্ব হাতে পেয়ে সমস্ত ব্যবস্থাকে পাকা করে তুললো। গোটা শহর সাজানো হলো নতুন করে। চিলির আসরে অংশ নিয়েছিল মোট ষোলোটি দেশ। এদের ভাগ করা হলো লীগ-ভিত্তিক পদ্ধতিতে চারটি বিভাগে। প্রতি বিভাগে রাখা হলো চারটি করে দল।

এই আসরে কোন দল শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাবে তা নিয়ে পণ্ডিতেরা গবেষণায় বসলেন। তাঁরা বললেন, ব্রাজিলের নবাগত নক্ষত্ররা যেভাবে খেলছে, তাতে তারাই হলো চিলির আসরে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ান। ব্রাজিল দলেরও আত্মপ্রত্যয় ছিল যথেষ্ট। কিন্তু গ্রুপ লীগের প্রথম খেলাতেই আহত হলেন পেলে। এই আঘাত তাঁকে চিলির আসর থেকে সরিয়ে রাখলো। গ্যালারীতে বসে তিনি কেবল দলের খেলা দেখলেন। চিলির আসরে পেলের ঘাটতি পূরণ করলেন একাই গ্যারিঞ্চা। তাঁর পিঠের ওপর চড়েই মূলতঃ বলা যায় ব্রাজিল দল চিলির আসরে চ্যাম্পিয়ানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

ক বিভাগে ছিল চারটি দেশ—রাশিয়া, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে ও যুগোশ্লাভ। এই বিভাগের তিনটি খেলায় দুটিতে জয় পেয়ে রাশিয়া শেষ ম্যাচ ড্র করে বসলো কলম্বিয়ার সঙ্গে। ম্যাচ শেষ হলো ৪—৪ গোলে। উরুগুয়ের

দুর্ভাগ্য তারা রাশিয়ার সঙ্গে ম্যাচটি হারায় শীর্ষস্থান থেকে বঞ্চিত হলো। বিভাগীয় ফলাফলে রাশিয়া তিনটি খেলায় পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হলো।

খ বিভাগে ইতালি পশ্চিম জার্মানীকে রুখে দিলেও তাদের পথ রোধ করতে পারলো না। চিলি ও সুইজারল্যাণ্ডকে হারিয়ে জার্মান দল পেলো শীর্ষস্থান। দ্বিতীয় স্থান দখল করলো চিলি। তারা জয় পেলো উরুগুয়ে ও সুইজারল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে।

গ বিভাগে অনন্য ফুটবলের পরিচয় দিলো ব্রাজিল। তারা ৪—৩—৩ প্রথায় ফুটবল খেলে চমকে দিলো বিশ্ববাসীকে। অনবদ্য ফুটবল খেললেন বেঁটে গ্যারিঞ্চা। তিনি নিয়েছিলেন ব্রাজিল দলের আক্রমণের দায়িত্ব। গ্যারিঞ্চার অনবদ্য ভূমিকায় ব্রাজিল গ্রুপ লীগের খেলায় জয় পেলো মেক্সিকো ও স্পেন দলের বিরুদ্ধে। একমাত্র ম্যাচ অমীমাংসিত থাকলো চেক দলের বিরুদ্ধে। এই গ্রুপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে এলো ব্রাজিল ও চেকোশ্লাভাকিয়া।

ঘ বিভাগে হাঙ্গেরী তাদের দাপট বজায় রাখতে কসুর করলো না। ষাটের ওলিম্পিকে এই সোনা-জেতা হাঙ্গেরী দলটি আগের মতো না হলেও, তাদের মধ্যে দলগত ঐক্য সংহতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনটি ম্যাচের মধ্যে তারা জয় পেলো দুটি ম্যাচে। শেষ খেলায় আর্জেন্টিনার সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা শেষ হওয়ায় তারা পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষস্থান পেল। দ্বিতীয় স্থান পেলো ইংল্যাণ্ড।

এর পর শুরু হলো নক আউট পদ্ধতিতে কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা। এই পর্যায়ের খেলায় রানকাগুয়ায় হাঙ্গেরী একতরফা ম্যাচ খেলেও হার স্বীকার করতে বাধ্য হলো চেক দলের কাছে। এই দিন হাঙ্গেরী দলের মোট আক্রমণের শতকরা দশভাগ যদি কার্যকরী হতো তাহলে তাদের পক্ষে বড়োসড়ো ব্যবধানে জয় পাওয়া অসম্ভব ছিল না। চেক খেলোয়াড়েরা ঠাণ্ডা মাথায় খেলে ম্যাচ জিতে গেল ১—০ গোলে।

সান্টিগোয়ায় প্রচণ্ড লড়াই করে পশ্চিম জার্মানীকে হারালো যুগোশ্লাভিয়া। অথচ এই ম্যাচটিতেও জার্মান দলটির হারার কোনো কথা ছিল

না। অন্তত দুটি ক্ষেত্রে জিলারের শট গোলরক্ষককে পরাস্ত করে ক্রশবারে লেগে ফিরে আসে।

আরিকায় বিস্ময়করভাবে জয় পেয়ে গেল চিলি। তারা এই ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান প্রথায় অর্থাৎ ৪-৩-৩ পদ্ধতিতে খেলে রাশিয়াকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক ইয়াসিন এই ম্যাচে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। তিরিশ গজ দূর থেকে মারা শট প্রথম তাঁর হাত ফসকে গোলে প্রবেশ করেছিল। দ্বিতীয় গোলটিও হয়েছিল ইয়াসিনের ব্যর্থতার জন্য। ফলে রাশিয়াকে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াতে হলো।

ভিনায় একা গ্যারিঞ্চা তছনছ করে ফেললেন বৃটিশ ফুটবলের রক্ষণ-ভাগকে। তাঁকে আটকে রাখার মতো কোনো খেলোয়াড় মাঠে ছিল না। বলকে কোন যাদুতে এইদিন গ্যারিঞ্চা বশ করেছিলেন তা একমাত্র ফুটবলের দেবতাই বলতে পারেন। পেলেহীন ব্রাজিলকে কোনো সময়ের জন্য চিন্তিত বলে মনে হলো না। অনায়াস ভঙ্গিতে সাবলীল প্রক্রিয়ায় তারা বিধ্বস্ত করলো নাকউঁচু ইংল্যাণ্ড দলকে। গ্যারিঞ্চা একাই দিলেন দুটি গোল। অন্য আর একটি গোল এলো ভাভার শট থেকে। ৩—১ গোলে জয় পেয়ে ব্রাজিল উঠে এলো সেমি-ফাইনালে।

সেমি-ফাইনালে ব্রাজিলকে মুখোমুখি হতে হলো ল্যাটিন-আমেরিকার আর একটি দেশ পেরুর সঙ্গে। এই ম্যাচে গ্যারিঞ্চা আবার অলৌকিক যাদুতে নিজেকে মেলে ধরলেন। একজন যাদুকর যেমনভাবে ইন্দ্রজাল তৈরী করে দর্শকদের মায়াময় জগতে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি গ্যারিঞ্চা এইদিন দর্শকদের নিয়ে গেলেন ফুটবলের স্বর্গীয় উদ্যানে। তাঁর বল কন্ট্রোল ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত নিখুঁত। ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে বল নিয়ে ছুটে প্রথম গোলটি তিনি করে এলেন। গতিতে, দক্ষতায় এই গ্যারিঞ্চা ছিল অকল্পনীয় পুরুষ। একজন ফুটবলার যে গোটা একটি দলকে এমনভাবে টেনে নিয়ে যেতে পারে তা চোখে না দেখলে কারো পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হতো। হয়তো এই কারণেই পণ্ডিতের দল চিলির বিশ্বকাপকে গ্যারিঞ্চার বিশ্বকাপ নামে সম্মানিত করেছেন।

চিলির রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা কোনো মুহূর্তের জন্যও পারে নি

মাঠের যে কোনো জায়গায় তাঁকে বলহীনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে। যেখানে বল সেখানেই দেখা গেছে গ্যারিঞ্চাকে। দ্বিতীয় গোলটি দেওয়ার সময় গ্যারিঞ্চা মাটি ছেড়ে লাফিয়ে ছিলেন এত উঁচুতে, যে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, একজন সেরা জাম্পারের পক্ষেও এত উঁচুতে চট করে লাফানো সম্ভব নয়। ব্রাজিলের হয়ে শেষ দুটি গোলই দিলেন ভাভা। ৪—১ গোলে জয় পেয়ে আবার ফাইনালে উঠলো ব্রাজিল। অন্যদিকে অত্যন্ত সহজভাবে জয় পেলো চেকোশ্লাভিয়া। তারা নিজেদের শক্তিকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ না করে ম্যাচ জিতলো যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে ৩—১ গোলে।

ফাইনাল্লে মিলিত হলো ব্রাজিল ও চেকোশ্লাভাকিয়া।

১৭ই জুন দুই দল মিলিত হলো সান্টিয়াগুয়ায়। তবে ফাইনাল ম্যাচটি ঘিরে যত না উত্তেজনা ছিল, তার চেয়ে বেশী উত্তেজনা ছিল তৃতীয় স্থান নির্বাচনী খেলায়। এই ম্যাচে চিলির প্রতিপক্ষ ছিল যুগোশ্লাভিয়া দল। চিলিবাসীর কাছে এই ম্যাচ স্বাভাবিক কারণেই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নিজের দেশের মাটিতে তারা আর হারতে রাজি নয়। আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে ভরা এই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হলো একেবারে শেষ সময়। চিলির কপাল জোর যে রোজাসের একটি দুর্বল শটে পরাস্ত হলো যুগোশ্লাভ গোলরক্ষক। বলটি আশ্চর্যজনকভাবেই তাঁর হাত পিছলে গোলের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এই একটি মাত্র গোলেই চিলি ম্যাচ জিতে পেয়ে গেল তৃতীয় স্থান।

এবার আসা যাক ফাইনাল ম্যাচটির কথায়। এই ফাইনাল ঘিরে প্রথমটায় যথেষ্ট চিন্তায় ছিলেন ব্রাজিল খেলোয়াড়েরা। গত ম্যাচে মাঠের মধ্যে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় গ্যারিঞ্চা সতর্কিত হয়েছেন। তাঁকে কি ফাইনালে খেলতে দেওয়া হবে? গ্যারিঞ্চা যদি দলের হয়ে খেলতে না পারেন, তাহলে এই ম্যাচে ব্রাজিলের পক্ষে জয়ের আশা খুব কম। একেই দলে পেলে নেই—তায় আবার যদি গ্যারিঞ্চাকেও খেলতে দেওয়া না হয় তাহলে তো ব্রাজিল দলের গোদের ওপর বিষফোঁড়া অবস্থা হয়ে উঠবে।

ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগেও কেউ সঠিক করে ফিফা কমিটির সিদ্ধান্তের কথা বলতে পারলো না। সাংবাদিকেরা ঘন ঘন ফোন করতে লাগলেন। শেষে বেশী রাত্রে টেলিফোনে ফিফা সভাপতি স্ট্যানলী রাউস জানালেন—

'গ্যারিঞ্চা ফাইনালে খেলতে পারেন, তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। সাসপেণ্ড করা হয়েছে চিলির ল্যাণ্ডাকে।'

ব্রাজিল তাঁবুতে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো। তারা ম্যাচ জেতার বাসনা নিয়েই নামলো মাঠে। শুরুতেই ব্রাজিলকে আক্রমণে আক্রমণে শঙ্কিত করে তুললো চেক দলটি। আক্রমণ সামলাতে সবাই নীচের দিকে নেমে এলো। ব্রাজিলের রক্ষণাত্মক ফুটবলের সুযোগ নিয়ে প্রথমার্ধেই ম্যাসোপেটের গোলে এগিয়ে গেল চেক দল। গোল খাওয়া ব্রাজিল মুহূর্তে নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো। আক্রমণে ফিরতে না পারলে চেকেরা তাদের আর কয়েকটা গোল দিয়ে ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে পারে। অতএব কালবিলম্ব না করে তারা পাল্টা আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লো চেক রক্ষণভাগের ওপর। আবার নেতৃত্ব দিলেন সেই বেঁটে গ্যারিঞ্চা। তাঁর ক্রীড়া-কৌশল মুহূর্তে উজ্জীবিত করলো গোটা দলকে। ফলে দশ মিনিটের মধ্যে গোল করে দিল ব্রাজিল। ভাভার কাছ থেকে বল পেয়ে গোল করলেন আমারিণ্ডো।

দ্বিতীয়ার্ধে মাঠ জুড়ে খেললো ব্রাজিলিয়ানরা। গ্যারিঞ্চা, ডিডি, ভাভা, জাগালো, আমারিণ্ডোর অসাধারণ বোঝাপড়ায় চেক দুর্গ ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেল। অসাধারণ তৎপরতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটি করলেন জিটো ও ভাভা। এই ম্যাচে গ্যারিঞ্চা নিজে কোনো গোল করতে না পারলেও প্রতিটি গোলের পিছনেই ছিল তাঁর পায়ের ঐশ্বরিক যাদুস্পর্শ। তিনি চিলির বিশ্বকাপ আসরে নির্বাচিত হলেন সেরা ফুটবলার। ব্রাজিলের এই জয়কে ঘিরে সাংবাদিকেরা বললেন—'চিলির বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সাফল্যের পিছনে গ্যারিঞ্চার ভূমিকাই হলো আসল। গ্যারিঞ্চা একাই এগারোজনের কাজ করেছেন। পেলের অনুপস্থিতি তিনি একবারের জন্যেও কাউকে বুঝতে দেন নি। অতএব চিলির বিশ্বকাপকে অনায়াসে গ্যারিঞ্চার বিশ্বকাপ বলা যেতে পারে।'

চিলির বিশ্বকাপ আসর পর্যালোচনা করে পণ্ডিতের দল বললেন—'আধুনিক ফুটবল বিজ্ঞানসম্মত পেশাদারী হওয়ার ফলে প্রতিটি দলই অতিমাত্রায় রক্ষণাত্মক ফুটবলের পরিচয় দিয়েছে। বিগত আসরগুলির মতো তাই চিলির আসরে কোনো দলকেই বড়োসড়ো ব্যবধানে জয় পেতে দেখা যায় নি। ফলে মোট গোলের সংখ্যাও চিলির আসরে খুব কম হয়েছে। মাত্র চারটি গোল

দিয়ে ছ-জন ফুটবলার পেয়েছিলেন সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান। এই ছ-জন ফুটবলারের মধ্যে ছিলেন ব্রাজিলের গ্যারিঞ্চা ও ভাভা, হাঙ্গেরীর আটবাট, চিলির এলসানচেজ, রাশিয়ার ইভানভ ও যুগোশ্লাভের জারকোভিক।'

চিলিতে ব্রাজিল বিশ্বকাপ জয় করায় তাদের মনোবল বাড়িয়ে দিল অনেকখানি। আগামী দিনে তারা চ্যাম্পিয়ান হয়ে চিরকালের জন্য সোনার পরীকে দখল নেওয়ার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠলো। বিশ্বকাপ আসরে একমাত্র ইতালি ও ব্রাজিল দলই দুবার করে এই কাপ দখল করার সম্মান পেয়েছে। অতএব তাদের সামনেই ছিল সোনার পরীকে চিরকালের জন্য কাছে পাওয়ার দাবী।

পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে, এই উত্তেজনাময় প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছিল ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপে। এর মাঝখানে ছেষট্টির বিশ্বকাপ কেবল পার হয়েছিল—আর সেই আসর বসেছিল ইংল্যাণ্ডে। এবার আমরা ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ আসরের দিকে চোখ রাখবো।

কলঙ্কিত বিশ্বকাপ : (১৯৬৬)

ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ছেষট্টির বিশ্বকাপ নানান ঘটনায় বিতর্কিত। নিজেদের দেশের মাঠে প্রাধান্য রক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ড যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা অত্যন্ত লজ্জার। বিগত দু-দুবারের চ্যাম্পিয়ান ব্রাজিলকে সম্মুখ সমরে হারানো যে তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে, একথা তারা জানতো। আর সেই কারণেই তারা নানান বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলো ব্রাজিল বিরোধী একটি গোষ্ঠি। বিগত দু-দুবারের আসরের অন্যতম নায়ক পেলে ও গ্যারিঞ্চাকে নিয়ে বৃটিশ সাংবাদিকেরা ফলাও করে সমালোচনা করলেন। তাঁরা বললেন—'কালোমানিক পেলে গতবার বিশ্বকাপে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। এবারের দলে তিনি থাকলেও তাঁর কাছ থেকে দর্শকেরা অভিনবত্ব কিছু খুঁজে পাবে না। তাঁর ফর্ম আগের মতো নেই। বরং এবারের আসরের অন্যতম নায়ক হলেন পর্তুগালের শার্দুল ইউসোবিও। ক্ষমতা ও দক্ষতায় ইউসোবিও পেলের সমগোত্রীয়। বয়সে তরুণ এই

খেলেয়াড়টি খেলার মান ও উৎকর্ষতায় পেলেকেও ছাপিয়ে যাবে।' ফলে কাগজে কাগজে ইউসোবিওর জয়গান করা হলো। পেলেকে নিয়ে করা হলো বিরূপ সমালোচনা।

বৃটিশ হীনমন্যতার চরমতম নিদর্শন পাওয়া গেল প্রাথমিক লীগের খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। দুর্বল রেফারিংয়ের কল্যাণে ইংল্যাণ্ড উঠে এসেছিল ফাইনালে। পেলেকে তারা ইউসোবিওর সঙ্গে তুলনা করে কেবল ক্ষান্ত হলো না, মাঠের মধ্যে পেলেকে যথেষ্ট মারধোর করা হলো। অথচ রেফারি দেখেও না দেখার ভান করে থাকলো। আহত পেলেকে জর্জরিত অবস্থায় মাঠ ত্যাগ করতে হলো। মনে মনে হাসলেন বৃটিশ কর্তারা। তারা ব্রাজিলকে ভেঙ্গে পড়তে দেখে মুখ টিপে হাসলেন।

ইংল্যাণ্ডের মাঠে অনুষ্ঠিত অষ্টম বিশ্বকাপ আসরেও প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে খেলার জন্য ষোলোটি দেশ তৈরী হয়ে এলো। এই ষোলোটি দেশকে ভাগ করা হলো চারটি করে দল নিয়ে এক-একটি গ্রুপ করে মোট চারটি গ্রুপে।

ক বিভাগে থাকলো ইংল্যাণ্ড, উরুগুয়ে, মেক্সিকো ও ফ্রান্স। খ বিভাগে পশ্চিম জার্মানী, আর্জেন্টিনা, স্পেন ও সুইজারল্যাণ্ড। গ বিভাগে পর্তুগাল, হাঙ্গেরী, ব্রাজিল ও বুলগেরিয়া এবং ঘ বিভাগে দেখা গেলো রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, ইতালি ও চিলিকে। বলা বাহুল্য এই প্রথম একটি বিশ্বকাপ আসরে এশিয়ার একটি দলকে অংশ নিতে দেখা গেল। এরা যে কেমন ফুটবল খেলে এই ধারণা ইউরোপের বহু দেশের কাছে অজানা ছিল।

১১ই জুলাই ওয়েম্বলিতে অনুষ্ঠিত অষ্টম বিশ্বকাপের শুভ উদ্বোধন। চারদিক রাজসিক রূপসজ্জায় সুসজ্জিত করা হলো। রাণী এলিজাবেথ মাঠে উপস্থিত হলেন। উদ্বোধনী ম্যাচে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে মাঠে নামলো ইংল্যাণ্ড। এই ম্যাচে ইংল্যাণ্ড তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও জয়ের মুখ দেখতে পেলো না। বরং ইংল্যাণ্ডের ভাগ্য প্রসন্ন থাকায় তারা কোনোরকমে এইদিন ম্যাচ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। বৃটিশ সমর্থকেরা খুশী হলেও রামসে খুশী হতে পারলেন না। তাঁর হয়তো ধারণা ছিল তাঁর দলটি প্রথম ম্যাচেই বড়োসড়ো গোলের ব্যবধানে জয়ের মুখ দেখতে পাবে। কার্যত তা না হওয়ায় তিনি মনের দিক দিয়ে বেশ খানিকটা দমে গেলেন।

শেফিল্ডে ঝড় তুললো পশ্চিম জার্মানী। তারা একতরফা ঝড়ের বেগে ফুটবল খেলে হার স্বীকার করাতে বাধ্য করালো সুইজারল্যাণ্ডকে। এই প্রথম বিশ্বকাপ আসরে আত্মপ্রকাশ করলেন ফুটবলের কাইজার বেকেনবাউয়ার। এই ম্যাচটি জেতার পেছনে মিড ফিল্ডার হিসাবে তাঁর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। ৫—০ গোলে জয় পেলো জার্মানী। বেকেনবাউয়ার ও হলার দিলেন ছুটি করে গোল।

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে এই গ্রুপের আর একটি খেলায় জয় পেলো আর্জেন্টিনা। তারা ২—১ গোলে হারালো স্পেনকে। পরের ম্যাচে আবার এই স্পেন দল অপ্রত্যাশিতভাবে জয় পেয়ে গেল সুইজারল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে মাঠে কম-সে-কম সাতজন বদলী নেমেছিলেন।

গ বিভাগে প্রথম ম্যাচে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে সহজ জয় পেলো ব্রাজিল। গোল করলেন পেলে ও গ্যারিঞ্চা। দর্শকেরা অবাক হয়ে দেখলেন পেলের খেলা। কে বলে মানুষটার মধ্যে ফুটবলের শিল্প সৌন্দর্য অবশিষ্ট নেই। গ্যারিঞ্চা তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেও, বোঝা গেল তিনি আগের তুলনায় অনেকটা শ্লথ হয়ে গেছেন। বছর দুয়েক আগের মটর দুর্ঘটনাই গ্যারিঞ্চার এই শ্লথগতির অন্যতম কারণ। প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়ায় ব্রাজিল দল আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলো।

ঘ বিভাগে রাশিয়া প্রথম ম্যাচে জয় পেলো উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে। ম্যাচটিতে হারলেও কোরিয়ান ফুটবলাররা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিলো। বেঁটে খাটো চেহারা নিয়ে তারা চমৎকার লড়াই করলো রাশিয়ার সঙ্গে। পরের ম্যাচে কোরিয়ান খেলোয়াড়েরা একটি পয়েন্ট ছিনিয়ে নিলো অভিজ্ঞ চিলির কাছ থেকে। শেষ ম্যাচে তারা অভাবনীয় ফুটবলের পরিচয় দিয়ে ম্যাচ জিতে গেল ইতালির বিরুদ্ধে। বিগত দু-দুবারের চ্যাম্পিয়ান ইতালির সে কি দুরাবস্থা! তিনটি ম্যাচের মধ্যে তাদের দুটি ম্যাচে হারতে হলো। ফলে এই বিভাগ থেকে রাশিয়ার সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার অনুমতি পেলো উত্তর কোরিয়া দলটি।

ক বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হলো ইংল্যাণ্ড। এই বিভাগ থেকে কোয়ার্টার

ফাইনালে উঠলো উরুগুয়ে। খ বিভাগের যে দুটি দল কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার সুযোগ পেলো তারা হলো পশ্চিম জার্মানী ও আর্জেন্টিনা।

গ বিভাগের খেলা নিয়ে সৃষ্টি হলো বিতর্ক। এই বিভাগ থেকে ব্রাজিল যাতে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার সুযোগ না পায় তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা বৃটিশ কর্তারা পাকা করে রেখেছিলেন। তাঁদের গোছানো পরিকল্পনা মতো কাজ করলেন বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গ রেফারি। হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রাজিল ভালো ফুটবলের পরিচয় দিয়েও ম্যাচ জিততে পারলো না। বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গেল হাঙ্গেরীর অনুকূলে। ফলে তাদের পক্ষে ব্রাজিলকে ৩—১ গোলে ম্যাচ হারাতে কোনো কষ্টই হলো না। পরের ম্যাচে পর্তুগাল মাঠের চেহারা রণভূমিতে পরিণত করলো। তারা চার-পাঁচজন মিলে মাঠের মধ্যে পেলেকে বেদম ঠেঙালো। অথচ আশ্চর্য, এতোবড়ো একটা ঘটনা চোখে দেখার পরও রেফারী তা এড়িয়ে গেলেন। আহত পেলে বাধ্য হলেন মাঠ ছাড়তে। অবস্থার গুরুত্ব বিচার করেই ব্রাজিল দান ছেড়ে দিল। তারা বুঝে গিয়েছিল ইংল্যাণ্ডের মাঠে তাদের ভাল খেলেও কোনো লাভ হবে না। পেলে বললেন—'ফুটবলে এখন শিল্প সৌন্দর্যের কোনো স্থান নেই। দিন দিন এই খেলাকে নৃশংস করে তোলা হচ্ছে। আমি আর ফুটবল খেলবো না।' বুদ্ধিমান বৃটিশ কর্তারা কেউই মুখ খুললেন না। তারা চোখে ঠুলি আর পিঠে কুলো বেঁধে নির্লজ্জের মতো চুপচাপ বসে থাকলেন।

ব্রাজিলকে বাধ্য হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে হলো।

কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় ইংল্যাণ্ড কোনোক্রমে ১—০ গোলে জয় পেলো উরুগুয়ের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচ সম্পর্কে সরব হলো উরুগুয়ের খেলোয়াড়েরা। তারা প্রকাশ্যে বললো—'এইভাবে যে কোনো দেশ নির্লজ্জ-ভাবে রেফারির সহায়তায় ম্যাচ জিততে পারে, তা ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে না খেললে বোঝা সম্ভব হতো না। ফুটবলকে ওরা কদর্য জায়গায় দাঁড় করাতে চাইছে।' যে যাই বলুন, এই জয়ে বৃটিশ কর্তারা খুশী হলেন। বুক ফুলিয়ে মুচকি হাসলেন রামসে। তিনি প্রকাশ্যে বলে বসলেন—'ইংল্যাণ্ড ছেষট্টির চ্যাম্পিয়ান হচ্ছেই।'

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে সহজ জয় পেলো পশ্চিম জার্মানী। তারা ম্যাচ জিতলো ৪—০ গোলে।

কোয়ার্টার ফাইনালের সেরা ম্যাচটি হলো উত্তর কোরিয়া বনাম পর্তুগালের মধ্যে। এশিয়ার এই দেশটির সম্পর্কে কারো কোনো উৎসাহ ছিল না। অনেকেই ধারণা করেছিলেন উত্তর কোরিয়া নামক খুদে মানুষের দলটি হয়ত প্রাথমিক লীগের পরই সরে পড়বে। কার্যত তাদের কোয়ার্টার ফাইনাল রাউণ্ডে উঠতে দেখে সকলেই বিস্মিত হলেন। এখানেই কিন্তু চমকের শেষ নয়। কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় তারা যেভাবে পর্তুগালকে চেপে ধরেছিল তাতে অভিজ্ঞতার ঘাটতি না থাকলে এই ম্যাচ তাদের হাত থেকে বার করে আনা পর্তুগালের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অসাধারণ গতি-বেগের মধ্যে ফুটবল খেলে কোরিয়া দল ৩—০ গোলে এগিয়ে গেল। খেলা তখন মাত্র গড়িয়ে ছিল ছাব্বিশ মিনিট। এরপর জয়ের জন্য আপ্রাণ লড়াই করতে হলো পর্তুগালকে। অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকায় কোরিয়ানরা শেষ রক্ষা করতে পারলো না। শেষ মুহূর্তে পর পর দুটি গোল দিয়ে ম্যাচটি কোনোরকমে বার করে আনলেন ইউসোবিও। উত্তর কোরিয়া হারলেও তারা পেলেন বিজয়ীর সম্মান। ইংল্যাণ্ডের পত্র-পত্রিকায় কোরিয়ানদের প্রশংসা করা হলো।

কোয়ার্টার ফাইনালের আর একটি খেলায় প্রচণ্ড লড়াই হলো রাশিয়া বনাম হাঙ্গেরীর মধ্যে। দুর্ধর্ষ খেলে রাশিয়ানরা ম্যাচ জিতলো ২—১ গোলে।

সেমি-ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে দুরন্ত খেলা চললো রাশিয়ান দলের। রাশিয়ানরা তখন ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন দেখছে। তারা খেলাটা শুরুও করেছিলো ভাল, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলো না। অভিজ্ঞ পশ্চিম জার্মানী স্ট্যামিনাকে মূলধন করে ম্যাচ জিতে গেল ২—১ গোলে।

ওয়েম্বলিতে জোরদার খেলা চললো ইংল্যাণ্ড বনাম পর্তুগালের মধ্যে। ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়েরা এই ম্যাচে জেতার জন্য প্রচণ্ড লড়াই করলো। অন্তত বলা যায় ইংল্যাণ্ড বিশ্বকাপ পর্যায়ে যতগুলি ম্যাচ খেলেছিল, তার মধ্যে এই ম্যাচটি সেরা। ববি চার্লটনের গোলে ইংল্যাণ্ড জয় পেলো ২—১ গোলে। ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন তাদের সার্থক হলো।

ফাইনাল ম্যাচটিকে ঘিরে উত্তেজনা উঠলো চরমে। এই প্রথম একটি ম্যাচে জেতার জন্য চিন্তায় পড়লো পশ্চিম জার্মানী। বিপক্ষে বৃটিশ ফুটবলারেরা অনেকটা স্নায়ুচাপ মুক্ত ছিলেন। ম্যানেজার রামসে এমনভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন, যা দেখে মনে হলো তিনি আগেভাগে জেনে বসে আছেন, এই ম্যাচের ফলাফল কি হবে। তিনি কি জানতেন? সেকথা বলা শক্ত, তবে এই ম্যাচ জেতার জন্য ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা দেখে বিস্মিত হওয়া ছাড়া পশ্চিম জার্মানীর কোনো উপায় ছিল না। বিশেষভাবে হাণ্টের দেওয়া তৃতীয় গোলটির ক্ষেত্রে যথেষ্ট বক্তব্য থেকে যায়। ম্যাচ তখন ২—২ গোলে চলছিল। এই অবস্থায় হাণ্টের পা ছোঁয়া বল ক্রশবারে লেগে গোল লাইনের ওপর ড্রপ পড়া মাত্র হাণ্ট গোলের আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। রেফারিও কাল বিলম্ব না করে বাজিয়ে দিলেন বাঁশি। বিক্ষোভে ফেটে পড়লো পশ্চিম জার্মানী। কিন্তু কে কার কথা শোনে। রেফারি আবার ততোক্ষণে খেলা শুরুর সংকেত দিয়েছেন। এই গোলের সিদ্ধান্ত দেখে জার্মান খেলোয়াড়েরা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লো। তারা বুঝলেন এই ম্যাচ ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে বার করে আনা সম্ভব হবে না। নিজের দেশের মাটিতে তারা যে কোনো উপায়ে চায় জুলেরিমেকে দখলে রাখতে, আর এই দখলের প্রশ্নে তারা যে কোনো ধরনের নোংরামো করতেও প্রস্তুত। ইংল্যাণ্ড ম্যাচ জিতলো ৪—২ গোলে। এই জয় নিয়ে বৃটিশ সমর্থকেরা ফলাও করে বললেও, কোনোরকম উচ্ছ্বাস দেখা গেলো না অন্য দেশগুলির। বরং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ আনলো উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, হাঙ্গেরী ও পশ্চিম জার্মানী। বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানী এই ম্যাচের ছবি পৃথিবীর সর্বত্র দেখাতে লাগলো। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—হাণ্টের দেওয়া তৃতীয় গোলটি কি বৈধ ছিল? ইজ—ইট—এ—গোল?

যারা সিনেমার পর্দায় এই ম্যাচটি দেখেছেন তারা কিন্তু কেউই গোল হয়েছে বলে স্বীকার করতে চান নি। কিন্তু স্বীকার না করলে আর কি হবে, খাতা কলমে তো ইংল্যাণ্ডের জয় স্বীকৃত। জুলেরিমের সঙ্গে খোদাই হয়ে গেছে তাদের নাম।

বৃটিশ কলঙ্কের এখানেই কিন্তু শেষ নয়। এরপর ইংল্যাণ্ডের মিউজিয়াম থেকে নিখোঁজ হলো জুলেরিমে। এতোবড়ো লজ্জা ঢাকার কোনো জায়গা ছিল না। কপাল ভালো শেষ পর্যন্ত নিখোঁজ কাপটি উদ্ধার হয়েছিল একটি কুকুরের সহায়তায়। ইজ্জত রক্ষা হয়েছিল বৃটিশ কর্তৃপক্ষের। তা না হলে বিশ্ববাসীর কাছে চিরকালের জন্য মাথা নত হয়ে যেত বৃটিশ রাজতন্ত্রের।

ইংল্যাণ্ডে ব্যর্থ ব্রাজিল আগামী বিশ্বকাপের জন্য তৈরী হলো। তৈরী হলো পশ্চিম জার্মানী, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, হাঙ্গেরী প্রভৃতি ফুটবলের শ্রেষ্ঠ দেশগুলি। মেক্সিকোর আসরে তারা কেউই ইংল্যাণ্ডকে ক্ষমা করতে রাজি নয়। এবার তারা দেখতে চায় ইংল্যাণ্ড দলের আসল চেহারাটি। ফলে নানান কারণে ১৯৭০ সালের মেক্সিকোর আসর জমজমাট হয়ে উঠলো।

মেক্সিকোর বিশ্বকাপে ব্রাজিলের বিশ্বজয় : (১৯৭০)

১৯৭০ সাল বিশ্ব ফুটবলের কাছে স্মরণীয় নজির সৃষ্টি করেছিল। এই আসরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল ফাইনাল ম্যাচটি। সেবার ফাইনালে মোকাবিলা করেছিল ইতালি ও ব্রাজিল। উভয় দলই বিশ্বকাপ দুবার করে জয় করার সম্মান পেয়েছিল। কাজেই এই আসরে যে জিতবে সেই পাবে ফিফার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চিরকালের জন্য জুলেরিমে কাপটি। ইতিহাস সাক্ষী করে দুরন্ত ফুটবলের পরিচয় দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত ব্রাজিল জয় করে নিয়ে গেল জুলেরিমে কাপ।

মেক্সিকোর আসরে ব্রাজিল যে মানসিকভাবে তৈরী হয়ে মাঠে নেমেছিল তা পরিষ্কার বোঝা গেল প্রাথমিক লীগের খেলা শুরু হওয়া মাত্র। শুধু ব্রাজিল নয়, এই আসরে নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচণ্ড লড়াই করেছিল ইতালি, পশ্চিম জার্মানী ও উরুগুয়ে। তবে ব্রাজিল যে দলগত শক্তির বিচারে সেরা ছিল একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

এবার বলি, মেক্সিকোর ফুটবল আসর নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। অনেক দেশের প্রতিনিধি আপত্তি করেছিলেন। এই আপত্তির কারণ ছিল এখানকার উষ্ণ আবহাওয়া। তাছাড়া মেক্সিকোর পাহাড়ী

পরিবেশ ইউরোপীয় দেশগুলির পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। কাজেই সব মিলিয়ে ইউরোপীয় সাংবাদিকেরা যথেষ্ট সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় নি। ফলে ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী দেশগুলিকে আসরে নামতে হয়েছিল।

মেক্সিকোর আসরে যোগ দিয়েছিল মোট ষোলোটি দেশ। এই ষোলোটি দেশের মধ্যে এবার অংশ নিয়েছিল তিনটি নতুন দেশ। এই তিনটি দেশ হলো যথাক্রমে সালভাদোর, মরোক্কো ও ইজরায়েল। ইংল্যাণ্ড তাদের গরিমাকে ধরে রাখার জন্য শক্ত দল গড়লেও, তাদের পক্ষে মেক্সিকোর পরিবেশ খুব একটা সুখকর ছিল না। সর্বত্র তাদের বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল। বরং মেক্সিকোর আসরে জনমন জয় করেছিল ব্রাজিল। দল হিসাবে তারা শক্তিশালী ছিল যথেষ্ট। যদিও পুরনো খেলোয়াড়েরা অনেকেই দলে ছিল না, তবু পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, মেক্সিকোর আসরে ব্রাজিলই একমাত্র দল যারা চেষ্টা করলে চ্যাম্পিয়ান হতে পারে। কিন্তু বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে কোচ সালধানাকে ব্রাজিল কর্তারা তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিলেন এবং তাঁর জায়গায় কোচ হিসাবে নিযুক্ত করলেন জাগালোকে। সালধানার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সংঘাতের কারণ ছিল পেলের নির্বাচন নিয়ে। সালধানা বলেছিলেন—'পেলের বয়স হয়েছে। তাঁর সেই আগের মতো দম নেই। তিনি উঠে-নেমে খেলতে পারবেন না। তাঁর জায়গায় বরং টোস্টাও অনেক বেশী কার্যকরী হবে।' সালধানা সরে যাওয়ার পর জাগালো দায়িত্ব হাতে নিয়ে ছক বদল করলেন। তিনি টোস্টাওকে জায়গা বদলে নতুন ছকে নতুন জায়গায় খেলালেন। পেলে খেললেন তাঁর নিজস্ব জায়গায়। এছাড়া দলে থাকলেন জিয়ারজিনো, রিভালিনো, গরসনের মতো খেলোয়াড়েরা।

৩০শে মে আজটেক ষ্টেডিয়ামে শুরু হলো মেক্সিকো বিশ্বকাপ আসর। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হলো রাশিয়া ও মেক্সিকো। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে খেলতে রাশিয়ানদের যথেষ্ট কষ্ট হলো। তবু তারা লড়াই করতে কসুর করলো না। ম্যাচ শেষ হলো গোলশূন্যভাবে। এই বিভাগের আর একটি খেলায় বেলজিয়াম অতি সহজে জয় পেলো নবাগত সালভাদোর দলের

বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচে রাশিয়া আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে ওঠায় বেল-জিয়ামের বিরুদ্ধে জয় পেলো ৪—১ গোলে। প্রথম ম্যাচটি অমীমাংসিত রাখলেও শেষ দুটি ম্যাচে জিতে মেক্সিকো পেলো কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার সুযোগ। অন্যদিকে গোল এ্যাভারেজে ক বিভাগে রাশিয়া শীর্ষস্থান পেয়ে গেল।

খ বিভাগে ইতালি মূলতঃ রক্ষণাত্মক ক্রীড়াধারার পরিচয় দিয়ে তিনটি খেলায় ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পেলো শীর্ষস্থান। দ্বিতীয় স্থান পেলো উরুগুয়ে।

গ বিভাগে ব্রাজিল অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিয়ে জয় পেলো তিনটি ম্যাচেই। ইংল্যাণ্ডকে মেক্সিকো আসরে হারিয়ে ছেষট্টির পরাজয়ের বদলা নিলো ব্রাজিল। গোল করলেন জিয়ারজিনো। পেলে অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিলেন। দেখে বোঝার উপায় ছিল না তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। প্রচণ্ড বিদ্রূপ সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড শেষ দুটি ম্যাচে জয় পেয়ে গেল। তাদের খেলার মধ্যে কোনোরকম ভাবোচ্ছ্বাস দেখা গেল না। তারা যেন মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

ঘ বিভাগে পশ্চিম জার্মানী তিনটি ম্যাচে সহজ জয় পেলো। তারা দিলো মোট দশটি গোল। দ্বিতীয় স্থান পেলো পেরু। তারা দুটি ম্যাচে জিতলেও হারতে বাধ্য হলো পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে।

কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলায় ষোলোটি দেশের মধ্যে নির্বাচিত হলো আটটি দেশ। এই আটটি দেশ হলো যথাক্রমে—ইতালি, ব্রাজিল, ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, পেরু, মেক্সিকো, উরুগুয়ে ও রাশিয়া।

কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী মিলিত হলো ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে ইংলিশ ফুটবলারেরা কেউই নিজেদের প্রতিষ্ঠা মতো খেলতে পারলো না। সমগ্র জার্মান দলটি পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ছিল বদ্ধপরিকর। তারা অতি সহজে বিধ্বস্ত করলো ইংল্যাণ্ডকে।

মেক্সিকোর বিরুদ্ধে সহজে জয় পেলো ইতালি। এই ম্যাচে রিভা, রিভেরা চমৎকার ফুটবলের পরিচয় দিলেন। ইতালির এই ম্যাচটি ছিল তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের প্রতিশ্রুতি।

অন্য দুটি খেলার মধ্যে ব্রাজিলের কাছে ৪—২ গোলে হারতে বাধ্য হলো পেরু। আবার গোল করলেন জিয়ারজিনো, রিভালিনো ও টোস্টাও।

রাশিয়ার দুর্ভাগ্য তারা আপ্রাণ লড়াই করেও উরুগুয়ের সঙ্গে ম্যাচ জিততে পারলো না। তাদের ১—০ গোলে হার স্বীকার করতে হলো।

এর পরই শুরু হলো সেমি-ফাইনালের জমজমাটি আসর। দুটি সেমি-ফাইনালের মধ্যে সেরা খেলাটি অনুষ্ঠিত হলো পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে ইতালির। দুটি দলই হলো ইউরোপের সেরা। তবে সাম্প্রতিক কালে জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ চেহারা নিয়েছিল পশ্চিম জার্মানী। তারা ইতিমধ্যে দুবার বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছে। কাজেই তারা সহজে ইতালিকে ছেড়ে দিলো না। এই ম্যাচটিতে জয়ের জন্য দুই দলকেই সমান তালে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। পৃথিবীর ফুটবল ইতিহাসে এমন খেলা আর দ্বিতীয়টি হয়েছে কিনা বলা শক্ত। এই ম্যাচে দুই দলের খেলোয়াড়েরাই নিজেদের সমস্ত শক্তিকে উজাড় করে দিলেন। প্রচণ্ড গতির মধ্যে বল ছুটে গেল এ গোল থেকে ও গোলে। নব্বুই মিনিটের খেলায় ফলাফল দাঁড়ালো ১—১। এই দিন মাঠের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন ফ্রন্‌জ বেকেনবাওয়ার। তিনি গোটা মাঠ জুড়ে খেললেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ক্রীড়ানৈপুণ্য গোটা মাঠকে মোহিত করে দিলো। আহত বেকেনবাওয়ার হাতে প্লাসটার নিয়ে মাঠে নামলেন। আহত হওয়ার পরও তাঁর খেলায় কোনো ঘাটতি দেখা গেল না। এরপর শুরু হলো অতিরিক্ত সময়ের খেলা। এই সময় খেলার মান অত্যন্ত উচ্চাঙ্গে গিয়ে পৌঁছেছিল। প্রথম দিকে দর্শকেরা ছিলেন পশ্চিম জার্মানীর সমর্থক, পরে সমর্থকেরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। একদল গোল দেয় তো অন্য দল গোল শোধ করে এগিয়ে যায়। কেউ কারো চেয়ে যে খাটো নয় তা পরিষ্কার বোঝা গেল। মোট একশ কুড়ি মিনিটের খেলায় সবাই বিধ্বস্ত। বুকের রক্ত শুকিয়ে আসছে, তবু জয়ের প্রত্যাশায় লড়াই করতে কেউই কুণ্ঠিত হলো না। দমে ঘাটতি পড়েছে, শরীর টলছে, তবু বলের দখল ছাড়তে কেউ রাজি নয়। এই অবস্থায় শেষ তিরিশ মিনিটে গোল হলো পাঁচটি। চমৎকার ফ্রি-কিক নিয়ে বেকেনবাওয়ার একটি দর্শনীয় গোল করলেন। অতিরিক্ত সময়ে প্রথম গোল করে এগিয়ে গেল জার্মান দল। এই ব্যবধান বেশীক্ষণ তারা ধরে রাখতে পারলো না। রিভেরার শট পোষ্টে লেগে ফেরৎ আসতেই সেই বলে পা ছোঁয়ালেন বার্গেনিচ। ফলাফল দাঁড়ালো

২—২। দশ মিনিটের মাথায় আবার গোল করে এগিয়ে গেলো ইতালি। ফলাফল দাঁড়ালো ৩—২।

অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় পর্বের খেলা শুরু হতে না হতেই গোল শোধ করলেন বেকেনবাওয়ার। ম্যাচের একেবারে অন্তিম লগ্নে গোল করলেন রিভেরা। এই গোলের ব্যবধানেই জয় পেয়ে গেল ইতালি। পশ্চিম জার্মানী এই ম্যাচে ব্যর্থ হলেও তারাই পেলো প্রকৃত বিজয়ীর সম্মান। বেকেনবাওয়ার নির্বাচিত হলেন মাঠের সেরা খেলোয়াড়।

ইতালি উঠে এলো ফাইনালে। এবার তাদের লড়তে হলো ব্রাজিলের সঙ্গে। আগেই বলেছি এই দুটি দেশ দুবার করে জুলেরিমে জয় করেছিল। কাজেই দুজনের কাছেই ছিল জুলেরিমে কাপ দখলের সমান সম্ভাবনা।

সে এক উত্তেজনাময় মুহূর্ত।

মেক্সিকোতে বাজির দর উঠলো সপ্তমে। প্রথম দিকে ব্রাজিল যতটা ফেভারিট ছিল, শেষ দিকে তাদের সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলো। এর কারণ ইতালির শেষ দুটি ম্যাচের পারফর্মনেস ছিল চমৎকার। কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমি-ফাইনাল এই দুটি ম্যাচে তারা অসাধারণ খেলেছে। চমৎকার ফুটবলের পরিচয় দিয়েছেন ফেচিত্তি, ডোমেনঘিঘি, মাজালো, রিভা। বিশেষ করে রিভার সূক্ষ্ম পায়ের কাজ ছিল যে কোনো শক্তিশালী ডিফেন্সকে ভাঙার পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া তুলনামূলক বিচারে ইতালির ডিফেন্স লাইন ছিল খুবই কঠিন। ব্রাজিলের ডিফেন্স যে ভালো নয় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল পেরু ও উরুগুয়ের খেলার দিন। তবু তারা আশাহত হলো না। জাগালো এই ম্যাচ সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তান্বিত ছিলেন। তিনি তাঁর খেলোয়াড়-দের নির্দেশ দিলেন—কোনোরকম আত্মরক্ষা না করে একটানা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে।

সমস্ত উত্তেজনা ও তর্কবিতর্কের অবসান হলো ২১শে জুন তারিখে। আজটেক ষ্টেডিয়ামে মিলিত হলো দুটি দেশ। ইতিহাস সাক্ষী করে জুলেরিমে এসে দাঁড়িয়েছিল অন্তিম লগ্নে। এই ম্যাচে যে জিতবে তার গলায় বরমাল্য তুলে চিরকালের জন্য বিশ্বফুটবল আঙ্গিনা থেকে সরে যাবে 'সোনার পরী'।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে শুরু হলো এই ম্যাচ। কিক্‌-অফের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণে ধেয়ে গেল ব্রাজিল। মাঝ মাঠ সম্পূর্ণভাবে দখলে রাখলেন জিয়ারজিনো। যে ডিফেন্স সম্পর্কে ইতালির এত গর্ব ছিল, সেই দুর্ভেদ্য ডিফেন্সকে পায়ের সূক্ষ্ম কাজে ভেঙ্গে চুরে দিলেন পেলে। মাঠে তিনি গ্রহণ করলেন অভিভাবকের ভূমিকা। একটানা আক্রমণে ইতালির রক্ষণভাগের অবস্থা মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, আর সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ফাটল গলে প্রথম দর্শনীয় গোল করলেন পেলে।

গোল এলো আঠারো মিনিটের মাথায়। দুরূহ কোণ থেকে জিয়ারজিনো চমৎকার সেণ্টার করলেন। বলের গতি আন্দাজ করে বর্ষীয়ান পেলে সরে এলেন একেবারে ফাঁকা জায়গায়। বল এসে পড়লো তাঁর মাথায়। আঠারো গজ দূর থেকে হেড করে পেলে দিলেন দলের হয়ে প্রথম গোল।

এই ব্যবধান ব্রাজিল কিন্তু ধরে রাখতে পারলো না। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই গোল শোধ করলেন বোগনসেনা। খেলায় সমতা আসামাত্র আহত সিংহের মতো ব্রাজিল ঝাঁপিয়ে পড়লো ইতালিয়ানদের ওপর। এই এক তরফা আক্রমণে ইতালির ডিফেন্স হলো ছত্রাকার। দ্বিতীয়ার্ধে এলো আরও দুটি গোল। এবার গোল করলেন জিয়ারজিনো। বলা বাহুল্য চলতি বিশ্ব-কাপ ফুটবলে জিয়ারজিনো একমাত্র ফুটবলার যিনি সব কটি ম্যাচেই গোল করেছিলেন। তৃতীয় গোল এলো গারসনের শট থেকে। চতুর্থ গোলটি ছিল দর্শনীয়। এই গোলের অন্যতম নায়ক হলেন পেলে। তিনি জিয়ার-জিনোর সঙ্গে চমৎকার বল দেওয়া-নেওয়া করে এগিয়ে গেলেন ইতালির সীমানায়। এই সময় পিছন থেকে উঠে এলেন অধিনায়ক আলবার্টো। পেলে গোলের কাছে পৌঁছে চমৎকার কায়দায় নিজে শট না করে ব্যাক হিল করে ঠেলে দিলেন আলবার্টোকে। চকিত শটে আলবার্টো করলেন চতুর্থ গোল। এই গোলের পরেই হাল ছেড়ে দিলো ইতালি। তারা বুঝতে পারলো এই ম্যাচে তাদের পক্ষে আর স্বাভাবিক জায়গায় ফিরে আসা সম্ভব নয়। ব্রাজিলিয়ানরা জয়ের আনন্দে ভরপুর। জুলেরিমে এলো তাদের দখলে। খেলা শেষের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাজিলের খেলোয়াড়েরা উল্লাসে ফেটে পড়লো। জয়ের আনন্দে জাতীয় পতাকা নিয়ে গোটা মাঠ

ঘুরলো তারা। চোখে জল দেখা গেল জিয়ারজিনো, পেলে, গ্যারিসনের। শয়ে শয়ে দর্শক মাঠে নেমে কোলে তুলে নিলো তাদের স্বপ্নের দুলাল পেলেকে।

ব্রাজিলের এই জয়ের ফলে বিশ্বকাপের একটি অধ্যায় শেষ হলো। বলা বাহুল্য এই ম্যাচে পেলে প্রথম গোলটি করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকাপ আসরে ব্রাজিল পূর্ণ করলো তাদের দলীয় শততম গোল।

মেক্সিকো আসরে মোট গোলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল চুরানব্বুইটি। এর মধ্যে ব্রাজিল দিয়েছিল মোট উনিশটি গোল। চলতি মরশুমে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেলেন পশ্চিম জার্মানীর কেশহীন কুশলী সেণ্টার ফরোয়ার্ড মূলার। তিনি দিয়েছিলেন মোট দশটি গোল। এই আসরে তৃতীয় স্থান পেলো পশ্চিম জার্মানী। তারা শেষ ম্যাচে উরুগুয়ে দলকে ১—০ গোলে হারিয়ে এই সম্মান পেলো।

সত্তর দশকের বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিলের সাফল্যের জন্য যে মানুষটি সর্বাধিক আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি হলেন জাগালো। পাঠকদের জানিয়ে রাখি, এই জাগালো বিগত দুটি বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলের সাফল্যের একজন অংশীদার ছিলেন। ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে তিনি ছিলেন জাতীয় দলের খেলোয়াড়। ১৯৭০ সালে ব্রাজিলের ঐতিহাসিক সাফল্যে তিনি ছিলেন দলের ম্যানেজার। কাজেই দেশের সাফল্যের পিছনে নিজেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত রাখা কম সৌভাগ্যের কথা নয়, সেই দিক দিয়ে অবশ্যই তিনি গর্বিত ব্যক্তি।

ব্রাজিলের জুলেরিমে কাপ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেদ পড়লো বিশ্বকাপ আসরের একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের—যে অধ্যায় বিশ্বকাপ আসরে 'সোনার পরী' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের রাজসিক অভিজ্ঞতার জৌলুষ-স্নাত বিশ্বকাপ, যা মশিয়ঁ জুলেরিমের সাধনার চরম ফলশ্রুতি—সেই কাপ ব্রাজিল চিরকালের জন্য জয় করে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো বিশ্বকাপের দ্বিতীয় পর্বের প্রস্তুতি—সে পর্বের নাম 'ফিফা কাপ'।

এই ফিফা কাপটির গড়ন জুলেরিমে কাপের মতো নয়। জুলেরিমে কাপ পরীর আকৃতিতে তৈরী হয়েছিল বলে এই কাপকে বলা হতো সোনার পরী।

কিন্তু ফিফা কাপের গড়ন সম্পূর্ণ আলাদা। এই কাপের মডেল তৈরী করেন বিখ্যাত ভাস্কর শিল্পী সিলভিও গাজানিও। তাঁর মডেল অনুসারে সুদৃশ্য কাপটিকে বাস্তবে রূপ দিলেন মণিকার বার্তোনি। ছত্রিশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য এই কাপটি আঠারো ক্যারেট সোনায় তৈরী। ট্রফিটি তৈরী করতে খরচ পড়েছিল বিশ হাজার ডলার।

এই নতুন কাপ তৈরী করে ফিফা কমিটি ঘোষণা করলেন—'পরবর্তী আসরে কোনো দেশ তিনবার ফিফা কাপ চ্যাম্পিয়ান হলেও এই কাপ তাদের হাতে চিরকালের জন্য তুলে দেওয়া হবে না।'

বলা বাহুল্য চুয়াত্তরের আসর অনুষ্ঠিত হলো পশ্চিম জার্মানীতে। কয়েক বছর আগে ওলিম্পিক আসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল মিউনিক শহরে। ওলিম্পিকের সাফল্য পশ্চিম জার্মানীর দাবীকে অনেকখানি জোরদার করে তুলেছিল। ফলে ফিফা কমিটি সিদ্ধান্ত নিলেন আগামী নতুন আসরটি পশ্চিম জার্মানীতেই অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭৪ সাল তাই বিশ্ব-ফুটবলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সোনার পরীর অধ্যায় শেষ করে শুভ সূচনা হলো ফিফা কাপের। শুরু হলো বিশ্ব-ফুটবলের আর এক নয়া অধ্যায়।

ফিফা কাপের সূচনা (১৯৭৪)

জার্মানীতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ আসরের মূল পর্বে অংশ নিলো মোট ষোলোটি দেশ। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে বাই দেওয়া হলো গত-বারের চ্যাম্পিয়ান ব্রাজিল এবং আয়োজনকারী দেশ পশ্চিম জার্মানীকে।

বিশ্বকাপ উপলক্ষে পশ্চিম জার্মানীতে বেশ কিছু নতুন ষ্টেডিয়াম তৈরী করা হলো। ঠিক হলো নয়টি শহরে খেলাগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে, কেবলমাত্র ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে মিউনিক শহরে।

প্রতিবারের মতো এবারেও ষোলোটি দেশকে ভাগ করা হলো চারটি বিভাগে। প্রতি বিভাগে থাকলো চারটি করে দল।

এবারের আসরে ফিফা কর্তৃপক্ষ নতুন এক সিদ্ধান্ত নিলেন। ঠিক করা হলো প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি বিভাগের চ্যাম্পিয়ান ও রানার্সদের নিয়ে

কোয়ার্টার ফাইনালের খেলাটি হবে লীগ ভিত্তিতে। এই পর্যায়ে থাকবে দুটি বিভাগ। প্রতি বিভাগে থাকবে চারটি করে দল। এই পর্যায়ে দুটি বিভাগে যারা চ্যাম্পিয়ান হবে তারাই পাবে ফাইনাল খেলার অধিকার।

১৩ই জুন অনুষ্ঠিত হলো প্রাথমিক পর্বের খেলা। উদ্বোধনী ম্যাচে বেকেনবাওয়ারের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানী ব্রিটনারের গোলে জয় পেলো পেরুর বিরুদ্ধে।

এবারের আসরে দুই নবাগত দেশ পূর্ব জার্মানী ও অষ্ট্রেলিয়ার খেলাটি খুব একটা উচ্চাঙ্গের হলো না। তবু প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেলো পূর্ব জার্মানী। এই ম্যাচে পূর্ব জার্মানীর জয় তাদের মনোবলকে বাড়িয়ে দিলো। পরের ম্যাচে চিলির বিরুদ্ধে তারা অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিলো। ম্যাচ শেষ হলো ১—১ গোলে। এবার পূর্ব জার্মানীকে মিলিত হতে হলো তাদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে। আগের দুটি ম্যাচে পশ্চিম জার্মানী জয় পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল রাউণ্ডে খেলার অধিকার পাকা করে ফেলেছিল। তবু এই ম্যাচটিকে ঘিরে উত্তেজনা উঠেছিল চরমে। এই ম্যাচে পূর্ব জার্মানীর ক্রীড়া-নৈপুণ্য অসাধারণত্বে পৌঁছেছিল। হাজার চেষ্টা করেও পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে সম্ভব হলো না এই ম্যাচ জেতার। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ম্যাচ চলে গেল পূর্ব জার্মানীর অনুকূলে। আরওয়াসের দেওয়া একমাত্র গোলে জয় পেয়ে ক বিভাগে শীর্ষস্থান পেলো পূর্ব জার্মানী। এই ম্যাচে পরাজয় পশ্চিম জার্মানীর আত্মবিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়ে গেল। তারা এবার আত্মতুষ্টি ছেড়ে নিজেদের নতুন করে গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করলো।

ক বিভাগে লীগ শেষে ফলাফল দাঁড়ালো যথাক্রমে ঃ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পূর্ব জার্মানী—	৩	২	০	১	৪	১	৫
পশ্চিম জার্মানী—	৩	২	১	০	৪	১	৪
চিলি—	৩	০	১	২	১	২	২
অষ্ট্রেলিয়া—	৩	০	২	১	০	৫	১

এবার আসি খ বিভাগের খেলায়। এই বিভাগে সেরা দল হিসাবে ব্রাজিল ছিল ফেভারিট। তারা গতবারের চ্যাম্পিয়ান। কাজেই তাদের

কাছ থেকে উন্নত ক্রীড়াধারাই সবাই আশা করেছিলো। কিন্তু কার্যত তা হলো না। বিভাগীয় প্রাথমিক লীগে ব্রাজিল অত্যন্ত নিম্নমানের পরিচয় দিলো।

প্রথম ম্যাচেই তারা ড্র করে বসলো যুগোশ্লাভিয়া দলের বিরুদ্ধে। সবাই মনে করেছিল পরের ম্যাচটিতে ব্রাজিল হয়ত তাদের খেলার স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পাবে। কিন্তু তা হলো না। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তারা দ্বিতীয় ম্যাচে স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জয়ের মুখ দেখতে পেলো না। ম্যাচ শেষ হলো গোলশূন্যভাবে। অন্যদিকে যুগোশ্লাভ প্রথম ম্যাচ জেতায় তাদের আত্মবিশ্বাস গিয়ে পৌঁছুলো চরম অবস্থায়। আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে তারা জায়ের দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতলো ৯—০ গোলে। অন্যদিকে স্কটল্যাণ্ড জায়েরের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ ২—০ গোলে জেতার পর ড্র করে বসলো পরের দুটি ম্যাচে। ব্রাজিলের সঙ্গে তারা খেলা শেষ করলো গোলশূন্যভাবে এবং যুগো-শ্লাভের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষ হলো ১—১ গোলে। ফলে খ বিভাগে শীর্ষস্থান পেলো যুগোশ্লাভ দল। দ্বিতীয় স্থান এলো ব্রাজিলের দখলে। তারা পর পর দুটি ম্যাচ শেষ করলো অমীমাংসিতভাবে। কেবল শেষ ম্যাচে তারা জায়ের দলের বিরুদ্ধে ৩—০ গোলে জয়ের সুবাদে গোল এ্যাভারেজে পেলো দ্বিতীয় স্থান।

খ বিভাগে ফলাফল দাঁড়ালো যথাক্রমে ঃ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
যুগোশ্লভিয়া—	৩	১	০	২	১০	১	৪
ব্রাজিল—	৩	১	০	২	৩	০	৪
স্কটল্যাণ্ড—	৩	১	০	২	৩	১	৪
জায়ের—	৩	০	৩	০	১৪	০	০

এবার আসা যাক গ বিভাগের খেলায়। এই বিভাগে সেরা দল ছিল হল্যাণ্ড। তাদের ফুটবল যথেষ্ট চমক সৃষ্টি করেছিল। তারা নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দিলো ফুটবলকে কত সহজে দ্রুতলয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আমরা এখন যে অল-আউট পদ্ধতির কথা প্রায়ই শুনতে পাই, তা মূলত হল্যাণ্ডের তৈরী। এই নয়া পদ্ধতিতে খেলে হল্যাণ্ড প্রথম ম্যাচেই জয় পেলো উরুগুয়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের পথ

প্রাথমিক পর্বের খেলা শেষ করে মোট আটটি দলকে খেলার সুযোগ দেওয়া হলো দ্বিতীয় পর্বের লীগ খেলায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই আটটি দলকে ভাগ করা হলো চারটি করে দল নিয়ে দুটি বিভাগে। ক বিভাগে স্থান পেলো হল্যাণ্ড, ব্রাজিল, পূর্ব জার্মানী ও আর্জেন্টিনা। খ বিভাগে রাখা হলো পশ্চিম জার্মানী, পোল্যাণ্ড, সুইডেন ও যুগোশ্লাভিয়া।

দ্বিতীয় পর্বের খেলায় হল্যাণ্ড অসাধারণত্বের পরিচয় দিলো। তাদের খেলা যেমন গতিময় তেমনি ছিল আক্রমণাত্মক। এই আক্রমণকে কার্যকরী করতে দেখা গেল পিছন থেকে সবাইকে ওপরের দিকে উঠে আসতে। এই পর্বে চমৎকার ফুটবলের পরিচয় দিলেন ক্রুয়েফ, ক্রল, রেপ। এদের সম্মিলিত আক্রমণের সামনে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আর্জেন্টিনা। প্রথম ম্যাচেই হল্যাণ্ড জয় পেলো ৪—১ গোলে। এই গ্রুপের খেলাগুলি যে উত্তেজনাময় হবে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। বিশেষ করে সেমি-ফাইনালে ওঠার জন্য ব্রাজিল বা পূর্ব জার্মানী কেউ সে চেষ্টা করতে কসুর করবে না তা জানা ছিল। কিন্তু পণ্ডিতদের সমস্ত অঙ্ক ভুল প্রমাণ করে দিলো হল্যাণ্ড। তারা অতি সহজে প্রথমে ২—০ গোলে হারালো পূর্ব জার্মানীকে এবং ব্রাজিলকে শেষ ম্যাচে হারালো ওই একই গোলের ব্যবধানে। তিনটি ম্যাচে হল্যাণ্ড দিলো ৮টি গোল। ক্রুয়েফ দিলেন তিনটি গোল, দুটি করে গোল দিলেন নিসকেল ও রেনসেনব্রিঙ্ক এবং একটি করে গোল এলো ক্রল ও রেপের পা থেকে। এই গ্রুপে হতাশ করলো ব্রাজিল। তারা তাদের সহজ ক্রীড়া-নৈপুণ্যকে মেলে ধরতে পারলো না। হল্যাণ্ডের কাছে হার স্বীকার করতে হলো ২—০ গোলে। কিন্তু পরের দুটি ম্যাচে তারা জীবনপণ যুদ্ধ করে ম্যাচ জিতলো পূর্ব জার্মানী ও আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে। যে পূর্ব জার্মানী প্রাথমিক লীগে পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করেছিল, সেই তারা দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ আসরে হেরে বসলো দুটি ম্যাচে। কোনো-রকমে শেষ ম্যাচ ড্র করলো আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে। ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে ক বিভাগে শীর্ষস্থান পেলো হল্যাণ্ড এবং দ্বিতীয় স্থান পেলো ব্রাজিল।

রুখে দাঁড়ালো সুইডেন দল। এই ম্যাচ শেষ হলো গোলশূন্যভাবে। কিন্তু শেষ ম্যাচে হল্যাণ্ড বুলগেরিয়াকে তছনছ করে ৪—১ গোলে জেতার সুবাদে পেয়ে গেল গ্রুপ লীগে শীর্ষস্থান। দ্বিতীয় স্থান পেলো সুইডেন।

এই গ্রুপে ফলাফল দাঁড়ালো :

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
হল্যাণ্ড—	৩	২	০	১	৬	১	৫
যুগোশ্লাভ—	৩	১	০	২	৩	০	৪
বুলগেরিয়া—	৩	০	১	২	২	৫	২
উরুগুয়ে—	৩	০	২	১	১	৬	১

ঘ বিভাগে খেলা শুরুর আগে ফেভারিট ছিল ইতালি। তারা গত-বারের রানার্স। কিন্তু প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলা শুরু হতেই ভুল ভাঙলো সকলের। যদিও ইতালি প্রথম ম্যাচে ৩—১ গোলে জয় পেয়েছিল হাইতির বিরুদ্ধে তবু তারা শেষ রক্ষা করতে পারলো না। আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে তারা ১—১ গোলে ম্যাচ শেষ করতে বাধ্য হলো। শেষ ম্যাচে সমর্থকদের হতাশ করে তারা হেরে বসলো পোল্যাণ্ডের কাছে। পোল্যাণ্ডের এই জয় তাদের পৌঁছে দিলো শীর্ষস্থানে। তিনটি ম্যাচেই তারা জয় পেলো। চমৎকার ফুটবলের পরিচয় দিলেন পোল্যাণ্ডের লাটো, জারমাক, তেইনা। অন্যদিকে আর্জেন্টিনা পোল্যাণ্ডের কাছে প্রথম ম্যাচে ৩—২ গোলে হারলেও জয় পেলো হাইতির বিরুদ্ধে। শেষ ম্যাচে ইতালি আর্জেন্টিনার খেলার ফলা-ফল হলো ১—১।

লীগ শেষে ফলাফল দাঁড়ালো এই রকম :

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পোল্যাণ্ড—	৩	৩	০	০	১২	৩	৬
আর্জেন্টিনা—	৩	১	১	১	৭	৫	৩
ইতালি—	৩	১	১	১	৫	৪	৩
হাইতি—	৩	০	৩	০	২	১৪	০

ক বিভাগের ফলাফল দাঁড়ালো যথাক্রমে ঃ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
হল্যাণ্ড —	৩	৩	০	০	৮	০	৬
ব্রাজিল —	৩	২	১	০	৩	৩	৪
পূর্ব জার্মানী—	৩	০	১	২	১	৪	২
আর্জেন্টিনা—	৩	০	২	১	২	৭	১

খ বিভাগে দাপটের সঙ্গে ফুটবল খেললো পশ্চিম জার্মানী। তারা তিনটি ম্যাচেই জয় পেয়ে পেলো শীর্ষস্থান। অভিজ্ঞ মুলার আবার নতুন করে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিলেন। পোল্যাণ্ড প্রথম ম্যাচে ২—১ গোলে হারালো যুগোশ্লাভিয়াকে। দ্বিতীয় ম্যাচেও তারা হারালো ১—০ গোলে স্যুইডেনকে। কিন্তু শেষ ম্যাচে তারা হারতে বাধ্য হলো পশ্চিম জার্মানীর কাছে। এই পর্যায়ে পোল্যাণ্ড দিয়েছিল মাত্র তিনটি গোল। আর এই তিনটি গোলের মধ্যে লাটো দিলেন ২টি গোল।

ফলাফল দাঁড়ালো ঃ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পশ্চিম জার্মানী—	৩	৩	০	০	৭	২	৬
পোল্যাণ্ড—	৩	২	১	০	৩	২	৪
স্যুইডেন—	৩	১	২	০	৪	৬	২
যুগোশ্লাভিয়া—	৩	০	৩	০	২	৬	০

ফলে দ্বিতীয় পর্বের লীগ শেষে ফাইনালে মিলিত হলো উভয় গ্রুপের শীর্ষস্থান দখলকারী দুটি দল—হল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানী।

৭ই জুলাই অনুষ্ঠিত হলো ফিফা কাপের ফাইনাল খেলা। তার আগে তৃতীয় স্থান দখলের জন্য লড়াই হলো পোল্যাণ্ড ও ব্রাজিলের মধ্যে। এই ম্যাচে ব্রাজিল আপ্রাণ চেষ্টা করেও হারাতে পারলো না পোল্যাণ্ডকে। শেষ মুহূর্তে লাটোর গোলে জয় পেয়ে গেল পোল্যাণ্ড। এই জয়ের ফলে তারা পেলো প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান।

এবার আসা যাক ফাইনালের কথায়। এবারের ফাইনালে কে জিতবে, সে কথা কোনো পণ্ডিতের পক্ষে আগেভাগে বলা সম্ভব হলো না।

তবু বাজির দর ছিল হল্যাণ্ডের পক্ষে। এর কারণ হলো হল্যাণ্ড এবারের আসরে সব কয়টি ম্যাচে জয় পেয়েছিল। তাদের গোলের সংখ্যা ছিল ছয়টি ম্যাচে চোদ্দোটি। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে মিউনিকে শুরু হলো ফাইনাল খেলা। ঝড়ের গতিতে খেলা শুরু করলো হল্যাণ্ড। প্রথম মিনিটেই ক্রুয়েফকে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ফাউল করার অপরাধে পেনাল্টি পেলো ডাচ দল। পেনাল্টি থেকে গোল করে নিসকেন্স দলকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এর পর হল্যাণ্ডের দাপট যেন আরও বেড়ে গেল। তারা শুরু করলো একের পর এক আক্রমণ। বাধ্য হয়ে জার্মান দল নেমে এলো নিজেদের সীমানায়। তারা কিছুতেই পাচ্ছিলেন না ক্রুয়েফকে ধরে রাখতে। বেশ কয়েকবার ব্রিটনার, বেনিফ অবৈধভাবে চার্জ করে কোনোরকমে তাঁকে আটকালেন। বোঝা গেল জার্মানদের পক্ষে এই ম্যাচ জেতা সহজ হবে না। দস্তুর মতো তাদের লড়াই করতে হবে। জার্মানী দল ম্যাচটি ধরার জন্য এবার নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। তারা ফোগটসকে পুলিশম্যান হিসাবে নিয়োগ করে চেষ্টা করলো ক্রুয়েফকে রাগিয়ে দিতে। এই কৌশলে কাজ হলো। বেশ কয়েকবার অবৈধভাবে মার খেয়ে মেজাজ হারিয়ে ফেললেন ক্রুয়েফ। ফলে তিনি মারমুখী হওয়ায় রেফারি তাঁকে হলুদ কার্ড দেখালেন। এতে খেলার স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হলো। বিরতির সময় দেখা গেল উত্তেজিত ক্রুয়েফ রেফারির সঙ্গে তর্ক করছেন।

বিরতির পর খেলা শুরু হলো অন্য প্রথায়। ফোগটসের কৌশলে ক্রুয়েফ বারবার প্রতিহত হওয়ায় ডাচ দল আর আক্রমণে যেতে চাইলো না। তারা ভেবেছিল এই একটি গোলের ব্যবধানেই ম্যাচ ধরে রাখবে। যাতে জার্মানরা আক্রমণে না যায় তার জন্য তারা আক্রমণ ছেড়ে শুরু করলো ফাউলের খেলা। ডাচেদের এই স্ট্যাটিজি যে কতটা ভুল ছিল তা বোঝা গেল অল্প সময়ের মধ্যে। স্ট্যামিনায় সেরা জার্মান দল হঠাৎ করে লম্বা পাশে খেলা শুরু করে হতচকিত করে দিলো ডাচ দলকে। মুলারকে পেছন থেকে ফাউল করার অপরাধে পেনাল্টি পেলো জার্মান দল। পেনাল্টি থেকে গোল করলেন ব্রিটনার। এই গোলের পরই আক্রমণে চেপে ধরলো জার্মান ফরোয়ার্ডেরা। উইং দিয়ে তারা একের পর এক সুযোগ তৈরী করতে লাগলো।

ক্রুয়েফ ফোগটসের কাছে বাধা পাওয়ায় ডাচ আক্রমণ অনেকখানি ঝিমিয়ে গেলো। তারা নেমে এলো নিজেদের সীমানার মধ্যে। ৬৩ মিনিটের মাথায় বেকেনবাওয়ারের একটি দুরন্ত শট গোলরক্ষক কোনোরকমে ঘুষি মেরে বাঁচালেন। এর দশ মিনিট বাদে অভিজ্ঞ মুলার একটি দর্শনীয় গোল করে দলকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। শেষ দশ মিনিট গোলের জন্য মরিয়া হয়ে খেললো হল্যাণ্ড। ক্রুয়েফ, ক্রল, রেপ একের পর এক আক্রমণ শানিয়েও পরাস্ত করতে পারলেন না গোলরক্ষক শেপ মেয়ারকে। সত্যি কথা বলতে কি শেষ মুহূর্তে মেয়ার যে ভাবে গোলরক্ষা করেছেন তা যদি না করতেন তাহলে চার-পাঁচ গোলের ব্যবধানে ডাচেদের এগিয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব হতো না। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হলো চুয়াত্তরের ফাইনাল। চ্যাম্পিয়ান হলো পশ্চিম জার্মানী। জার্মান প্রেসিডেণ্ট ভালটার শীল্ড ফিফা কাপটি তুলে দিলেন পশ্চিম জার্মানী দলের অধিনায়ক বেকেনবাওয়ারের হাতে। শুধু চ্যাম্পিয়ান ট্রফিটি জার্মান দল পেলো না, সেই সঙ্গে তারা পেলো প্রতিযোগিতায় 'ফেয়ার প্লে'র সম্মান। চলতি আসরে সর্বোচ্চ গোল-দাতার সম্মান পেলেন পোল্যাণ্ডের লাটো। তিনি দিয়েছিলেন সর্বসাকুল্যে ৭টি গোল।

এই আসরে হল্যাণ্ড দল হারলেও তারা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল। বিশেষভাবে সকলের মন জয় করেছিলেন ক্রুয়েফ। পরবর্তী বছরগুলিতে সেই কারণে তাঁর বাজার দর উঠেছিল চরমে। পশ্চিম জার্মানীর এই জয়ের ফলে আবার নতুন করে বিশ্বফুটবলে ইউরোপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পেলো। অধিনায়ক বেকেনবাওয়ার জয়ের আনন্দে অভিভূত হয়ে ফিফা কাপটি তুলে দিলেন দিনের সেরা খেলোয়াড় শেপ মেয়ারের হাতে। প্রকাশ্যে ফ্রন্জ বেকেনবাওয়ার বললেন—'মেয়ার এই দিন গোলে না থাকলে আমাদের পক্ষে ম্যাচ জেতা সম্ভব হতো না। এই জয় আমরা তাঁর জন্য পেয়েছি।'

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে শেষ হলো চুয়াত্তরের আসর। সেইসঙ্গে ঠিক হলো আগামী আটাত্তরের আসর বসবে আর্জেন্টিনায়।

আর্জেন্টিনার স্বপ্ন সফল হলো : (১৯৭৮)

১৯৭৮ সাল।

বিশ্বকাপের একাদশতম আসর অনুষ্ঠিত হলো আর্জেন্টিনায়। আয়োজনকারী দেশের মর্যাদা পেয়ে আর্জেন্টিনাবাসী সবাই খুশী। এই সুযোগ আর্জেন্টিনার কাছে প্রথম এসেছিল ১৯৭০ সালে। কিন্তু সে সময় গৃহ অশান্তিতে বিব্রত আর্জেন্টিনা এই দায়িত্ব নিতে চায় নি। তারা সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু আটাত্তর সালে দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা লুফে নিলো। নতুন করে সাজানো হলো বুয়েনস এয়ারস্ শহরকে। মোট যোলোটি দেশ পেলো প্রাথমিক পর্বে খেলার অধিকার। ঠিক হলো খেলা হবে লীগ ভিত্তিতে। চারটি করে দল নিয়ে তৈরী হলো এক-একটি বিভাগ। চারটি বিভাগের লীগ ভিত্তিতে খেলার পর প্রতি বিভাগের প্রথম দুটি দলকে নিয়ে শুরু করা হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলা। এই খেলা হবে চারটি করে দল নিয়ে দুটি বিভাগে। এর পর দুটি বিভাগের প্রথম দুটি দলকে নিয়ে হবে ফাইনাল খেলা।

এবারের আসরে বিশ্বের সেরা দেশগুলি সবাই প্রায় তৈরী হয়ে এসেছিলো। কেউ কাউকে যুদ্ধক্ষেত্রে সহজে যে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি হবে না, তা পরিষ্কার বোঝা গেল। প্রাথমিক লীগ শুরু হওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের দল মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন—'আটাত্তরের আসরে সম্ভবতঃ আর্জেন্টিনাই চ্যাম্পিয়ান হবে। তারা যে ভাবে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে অনুশীলন করেছে তাতে বিশ্বকাপ পাওয়া তাদের পক্ষে খুব একটা কষ্টকর হবে না।' বিশেষভাবে আর্জেন্টিনার স্বপক্ষে প্রথম কথা বলেছিলেন পোল্যাণ্ড ফুটবল এসোসিয়েশনের টেকনিক্যাল ডিরেক্টার মিস্টার জ্যাকমোপা। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন—'আমার ধারণা, আটাত্তরে আর্জেন্টিনাই চ্যাম্পিয়ান হবে।'

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে স্বস্তি পেয়েছিলেন কোচ মেনোত্তি। চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পর তিনি হাঁফ ছেড়ে বললেন—'আমি এতোদিন কামানের সামনে দাঁড়িয়ে দিন গুনছিলাম।'

সত্যি বলতে কি, আটাত্তরের আসরে চমৎকার ফুটবল খেলেছিল

আর্জেন্টিনা। তাদের খেলার মধ্যে ধারাবাহিকতা ছিল, ছিল দক্ষতার গভীরতা। দলে ছিলেন ক্যামপেশ, পাসারেলা, লুকের মতো ফুটবলার। ঐক্যবদ্ধ আক্রমণে তাঁরা ফুটবলে একটি দৃষ্টান্ত তৈরী করলেন। আবার বিপরীত দিকে ব্যর্থতার চরমতম নিদর্শন রাখলো ব্রাজিল, পশ্চিম জার্মানী ও ইংল্যাণ্ড। যে ব্রাজিল সম্পর্কে বিশ্ববাসীর বিরাট ধারণা সেই তারাই ব্যর্থ হলো সবচেয়ে বেশী। সমর্থকেরা ব্রাজিলের ছন্দহীন ফুটবল দেখে হতাশ হলেন। কোচ কুটিনহো লজ্জায় মুখ ঢাকার মতো রুমাল পেলেন না। সমালোচনায় তাঁকে ক্ষতবিক্ষত হতে হলো। তবু প্রশ্ন ছিল ব্রাজিল কি একেবারেই অযোগ্য? তারা কি ফাইনালে যেতে পারতো না? এর উত্তর দিতে গিয়ে একদল সমালোচক বলেছেন—'ব্রাজিল ফাইনালে নিশ্চয় উঠতে পারতো, যদি পেরু বিশ্বাসঘাতকতা না করতো। উচিত ছিল আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের খেলা দুটি একই সময় খেলানো। যদি একই সময় দুটি ম্যাচ খেলানো হতো তাহলে হয়তো আটাত্তরের ফলাফল হতো অন্যরকম।' এই ব্যাপারে ব্রাজিলেরও ছিল একই দাবী। তারা চেয়েছিল উভয় দলের শেষ ম্যাচটি একই সময় যেন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের আবেদনে কর্ণপাত করেন নি। পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল রেখেই ব্রাজিলের খেলাটি শুরু করা হয়েছিল আগে, যার ফলে আর্জেন্টিনা গড়াপেটার খেলায় পেরুকে অনায়াসে বড়োসড়ো ব্যবধানে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠে এসেছিল একমাত্র গোল এ্যাভারেজের হিসাবে। আর্জেন্টিনার এই জয়কে তাই অনেকেই মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। সমালোচনায় জর্জরিত হয়েছিল পেরু।

এখন কথা হলো আর্জেন্টিনা যে ভাবেই সেমি-ফানইালে উঠুক না কেন, ব্রাজিল যে তাদের স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারে নি একথা সত্যি। যদি তারা তাদের বিগত ঐতিহ্য অনুযায়ী খেলতে পারতো তাহলে নিশ্চয় তাদের শেষ ম্যাচটির গোল এ্যাভারেজের ওপর নির্ভর করতে হতো না।

ব্রাজিলের মতো দর্শকদের হতাশ করেছিল পশ্চিম জার্মানী। তারা আগাগোড়া রক্ষণাত্মক ফুটবলের পরিচয় দিয়ে গেল। ইংল্যাণ্ডের অবস্থা হলো আরও শোচনীয়। একমাত্র ইতালি প্রাথমিক লীগে জিতেছিল সব কটি ম্যাচে। সেই কারণে অনেকে আশা করেছিলেন ইতালি হয়তো ফাইনালে

পৌঁছুলেও পৌঁছুতে পারে। কার্যত তা হলো না। দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে ইতালি তাদের মান ধরে রাখতে পারলো না ফলে তাদের লড়াই থেকে ছিটকে যেতে হলো। গতবারের রানার্স হল্যাণ্ড এবার চ্যাম্পিয়ান হওয়ার জন্য তৈরী হয়ে এসেছিল আর্জেন্টিনায়। কিন্তু তারা চমৎকার এ্যাটাকিং ফুটবল খেলেও পারে নি নিজেদের সাফল্যমণ্ডিত মহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে। ফাইনালে তারা দ্বিতীয়বার উঠে প্রাণপণ লড়াই সত্ত্বেও হারতে বাধ্য হলো। ১৯৩০ সালের পর আর্জেন্টিনা দ্বিতীয়বার উঠেছিল ফাইনালে। সেই কারণে তারা মর্যাদা রক্ষার লড়াইতে হয়েছিল বদ্ধপরিকর। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে জয় পাওয়া আর্জেন্টিনার মানুষ সেদিন জয়ের উন্মাদনায় নেমে এসেছিল রাজপথে। তারা এই দিনটিকে উপভোগ করেছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে।

এবার ফিরে আসা যাক প্রাথমিক লীগ প্রসঙ্গে। ১লা জুন শুরু হলো বিশ্বকাপের শুভ উদ্বোধন। খেলা হলো পোল্যাণ্ড বনাম পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে। ম্যাচটি প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়েছিল। এইদিন একতরফা ফুটবল খেলেছিল পোল্যাণ্ড দল। তারা কম-সে-কম দশটি পজিটিভ মুভ তৈরী করেও তাকে কাজে লাগাতে পারে নি একমাত্র অভিজ্ঞ জার্মান গোলরক্ষক শেপ জেয়ারের জন্য। গোটা দলকে অভিজ্ঞ জেয়ার একা কাঁধে নিয়ে খেলে গেলেন। এইদিন তিনি গোলে না থাকলে জার্মানীরা যে কত গোলে ম্যাচ হারতো তার কোনো সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। প্রথম ম্যাচে জিততে না পারলেও পরের দুটি ম্যাচে জয় পেলো পোল্যাণ্ড। চমৎকার ফুটবল খেললেন পোল্যাণ্ড দলের লাটো। অন্যদিকে পশ্চিম জার্মানী আবার কোনোক্রমে ম্যাচ ড্র করতে বাধ্য হলো নবাগত টিউনেশিয়ার বিরুদ্ধে। বিশ্বকাপ আসরে টিউনেশিয়ার এই প্রথম আবির্ভাব। কিন্তু তাদের খেলার ধরন ও রীতিনীতি দেখে সকলেই অবাক। জার্মানের মতো অভিজ্ঞ দলটিকে তারা আক্রমণের চাপে একেবারে কোণঠাসা করে রেখেছিল। কেবল অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য তারা এইদিন ম্যাচ জিততে পারলো না। তবে তারা শেষ ম্যাচে অনায়াসে হারিয়ে দিলো মেক্সিকোকে। ম্যাচ জিতলো ৩—১ গোলে।

শেষ পর্যন্ত খ বিভাগের ফলাফল দাঁড়ালো যথাক্রমে ঃ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পোল্যাণ্ড—	৩	২	০	১	৪	১	৫
পশ্চিম জার্মানী—	৩	২	১	০	৬	০	৪
টিউনেশিয়া—	৩	১	১	১	৩	২	৩
মেক্সিকো—	৩	০	৩	০	১২	০	০

ক বিভাগে ইতালি আগাগোড়া প্রতিটি ম্যাচেই ভালো খেলার নিদর্শন রাখলো। চমৎকার খেললেন পাওলা রোসি, বেগেটা, বেনেট্রির মতো খেলোয়াড়েরা। তারা প্রথম ম্যাচে হারালো ফ্রান্সকে ২—১ গোলে। দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেলো হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে ৩—১ গোলে। অন্যদিকে আর্জেন্টিনার সঙ্গে খেলাটি হয়ে উঠলো আকর্ষণীয়। এইদিন মাঠের অধিকাংশ সমর্থক ছিলেন আয়োজনকারী দেশ আর্জেন্টিনার পক্ষে। এতো করেও আর্জেন্টিনা কিন্তু হার এড়াতে পারলো না। তারা ম্যাচ হারলো ১—০ গোলে। এই জয়ের সুবাদে ইতালি পেলো শীর্ষস্থান। ফলাফল দাঁড়ালো ঃ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইতালি—	৩	৩	০	০	৬	২	৬
আর্জেন্টিনা—	৩	২	১	০	৪	৩	৪
ফ্রান্স—	৩	১	২	০	৫	৫	২
হাঙ্গেরী—	৩	০	৩	০	৩	৮	০

গ বিভাগে ফেভারিট ছিল ব্রাজিল। সবাই ভেবেছিল ব্রাজিল বিভাগীয় লীগে শীর্ষস্থান রাখবে। কিন্তু খেলা শুরু হওয়া মাত্র ভুল ভাঙ্গলো। প্রথম ম্যাচেই তাদের রুখে দিল সুইডেন। এক গোলে এগিয়ে থাকা ব্রাজিল সারাক্ষণ ম্যাচ ধরে রেখেও শেষ রক্ষা করতে পারলো না। সোয়েবার্গের গোলে সমতা ফিরে পেলো সুইডেন। দ্বিতীয় ম্যাচে স্পেনের বিরুদ্ধে ব্রাজিল আবার রাখলো হতশ্রী ফুটবলের পরিচয়। ফলে পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচটিকে নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা গেল। ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ড দাপটের সঙ্গে খেলে দুটি ম্যাচেই জিতে বসেছিল। ফলে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্যাচটিকে নিয়ে তাদের মনে কোনোরকম দুশ্চিন্তা ছিল না। এই ব্রাজিল আক্রমণে

ঝাঁপিয়ে পড়তে ভুল করলো না। তারা বুঝেছিল নিজেদের গুটিয়ে রাখলে এই ম্যাচে জেতা মোটেই সম্ভব হবে না। ফলে তারা আগাগোড়া আক্রমণাত্মক ফুটবলের পরিচয় দিলো। শেষ মুহূর্তে রবার্টোর গোলে মান রক্ষা হলো ব্রাজিলের। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে একই পয়েন্ট পেয়ে তারা উঠে এলো দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে। তবে গোল এ্যাভারেজে শীর্ষস্থান পেলো পোল্যাণ্ড। ফলাফল দাঁড়ালো যথাক্রমে ঃ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পোল্যাণ্ড—	৩	২	১	০	৩	২	৪
ব্রাজিল—	৩	১	০	২	২	১	৪
স্পেন—	৩	১	১	১	২	২	৩
সুইডেন—	৩	০	২	১	১	৩	১

ঘ বিভাগের চারটি দলের মধ্যে ফেভারিট ছিল স্কটল্যাণ্ড। কিন্তু ম্যাচ শুরু হওয়া মাত্র সেই ধারণা বদলে গেল। পেরু অসাধারণ ফুটবল খেলে প্রথম ম্যাচেই হারিয়ে দিলো স্কট দলকে। এই ম্যাচে স্কট দল দাঁড়াতেই পারলো না। ৩—১ ম্যাচে জিতে গেল পেরু। এই ম্যাচের অন্যতম নায়ক ছিলেন পেরুর জনপ্রিয় বর্ষিয়ান তারকা কিউবিলাশ। কিউবিলাশ বিগত ত্নটি বিশ্বকাপেও খেলেছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে এই ম্যাচে কাজে লাগাতে ভুল করলেন না। পরের ম্যাচেও পেরু জয় পেলো ইরানের বিরুদ্ধে। এইদিন দলের হয়ে হ্যাটট্রিক করলেন কিউবিলাশ। এটি হলো এবারের আসরে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। প্রথম হ্যাটট্রিক এই আসরে করেছিলেন হল্যাণ্ডের রেনসেনব্রিঙ্ক। হল্যাণ্ড এই ম্যাচে জয় পেয়েছিল ইরানের বিরুদ্ধে। ইরানীরা প্রথম ম্যাচ হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে তারা একটি পয়েণ্ট ছিনিয়ে নিলো স্কটল্যাণ্ডের কাছ থেকে। শেষ ম্যাচে হল্যাণ্ড ও পেরুর মধ্যে খেলাটি শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। তিনটি ম্যাচের মধ্যে ত্নটিতে জয় পেয়ে পেরু হলো প্রথম। হল্যাণ্ড পেলো দ্বিতীয় স্থান। ফলাফল দাঁড়ালো যথাক্রমে এইরূপ ঃ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পেরু—	৩	২	০	১	৭	২	৫
হল্যাণ্ড—	৩	১	১	১	৫	৩	৩
স্কটল্যাণ্ড—	৩	১	১	১	৫	৬	৩
ইরান—	৩	০	২	১	২	৮	১

প্রথম পর্যায়ের খেলা শেষ করে শুরু হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা। দ্বিতীয় পর্যায়ের দুটি বিভাগের মধ্যে একটিতে থাকলো (ক বিভাগ) হল্যাণ্ড, ইতালি, পশ্চিম জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া। অন্য আর একটি বিভাগে (খ বিভাগ) জায়গা পেলো আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পোল্যাণ্ড ও পেরু।

দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগের ক বিভাগে নিঃসন্দেহভাবে ফেভারিট ছিল ইতালি। প্রাথমিক লীগে তারা যেভাবে খেলেছিল, তাতে মনে হয়েছিল, তারাই হয়তো এই বিভাগ থেকে সহজে ফাইনালে উঠে আসবে। তাছাড়া বর্তমান ইউরোপে ইতালি হলো একটি সেরা দল। অথচ খেলা শুরু হতে না হতেই পণ্ডিতের দল নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। এই পর্যায়ে হল্যাণ্ড রাখলো অসাধারণ ঝড়ো ফুটবলের পরিচয়। তাদের দাপটের সামনে প্রথম ম্যাচেই খড়কুটোর মতো ভেসে গেল অষ্ট্রিয়া। হল্যাণ্ড ম্যাচ জিতলো ৫—১ গোলে। খ বিভাগের প্রথম ম্যাচেই পেরু হারলো ব্রাজিলের কাছে। ব্রাজিলের খেলা দেখে মনে হলো তারা যেন তাদের হারানো আত্মবিশ্বাস অনেকখানি খুঁজে পেয়েছে। ফলে নতুন করে গুঞ্জন শুরু হলো। এরপর ইতালি হারালো অষ্ট্রিয়াকে ১—০ গোলে। ফলে অষ্ট্রিয়া প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেল। হল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ম্যাচটি ছিল উত্তেজনায় ভরা। এইদিন তাদের দুরন্ত লড়াই করতে হলো পশ্চিম জার্মানীর সাথে। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে খেলা শেষ হলো ২—২ গোলে। তাহলে পশ্চিম জার্মানী কি প্রতিযোগিতায় ফিরে আসবে ? এই সম্ভাবনা কয়েকদিনের মধ্যেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হলো। শেষ দুটি ম্যাচে তাদের তিনটি পয়েন্ট হারাতে হলো। ফলে খেলা জমে উঠলো হল্যাণ্ড ও ইতালির মধ্যে। প্রথমেই এই ম্যাচে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল হল্যাণ্ড। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলায় সমতা ফিরিয়ে এনেছিল ইতালি। এরপর উত্তেজনা উঠলো চরমে। গতবারের রানার্স হল্যাণ্ড ছাড়ার পাত্র নয়। তারা সমস্ত শক্তি উজাড় করে ফুটবল খেললো। তাদের চেষ্টার ফল ফললো একেবারে শেষ মুহূর্তে। সমাপ্তির বারো মিনিট আগে হ্যানের দূরপাল্লার জোরালো শটে পিছিয়ে গেল ইতালি। এই গোল তাদের পক্ষে শোধ করা সম্ভব হলো না। ফলে গতবারের রানার্স হল্যাণ্ড ক বিভাগ থেকে উঠে এলো ফাইনালে।

এই পর্যায়ে ফলাফল দাঁড়ালো :

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
হল্যাণ্ড—	৩	২	০	১	৯	৪	৫
ইতালি—	৩	১	১	১	২	২	৩
পঃ জার্মানী—	৩	০	১	২	৪	৫	২
অষ্ট্রিয়া—	৩	০	১	২	৪	৮	২

খ বিভাগে লড়াই জমলো প্রচণ্ড। ব্রাজিল প্রথম ম্যাচে পেরুকে হারালো ৩—০ গোলে। পরের ম্যাচেও তারা জয় পেলো পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে ব্রাজিল জিতলো ৩—১ গোলে। অন্যদিকে আর্জেন্টিনা পোল্যাণ্ডকে ২—০ গোলে হারালো। দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের মুখোমুখি হতে হলো ব্রাজিলের সঙ্গে। এই ম্যাচ প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে শেষ হলো গোল-শূন্যভাবে। এমত অবস্থায় উভয় দলের শেষ ম্যাচ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আর্জেন্টিনাকে লড়াই করতে হবে পেরুর সঙ্গে, অন্যদিকে ব্রাজিল খেলবে পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। গোলের হিসাবে ব্রাজিল তখন এগিয়ে ছিল। সেই কারণে তারা দাবী করেছিল উভয় দলের শেষ ম্যাচটি যেন একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। নচেৎ একটি ম্যাচের ফলাফল অন্য একটি দলের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। ব্রাজিলের যুক্তি একেবারে মিথ্যে ছিল না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। ফলে ব্রাজিলকে আগে নামতে হলো। এই ম্যাচে ব্রাজিল ৩—০ গোলে জয়ের সুবাদে ফাইনালে ওঠার ব্যাপারে মানসিকভাবে এগিয়ে গেল অনেকখানি। তারা তিনটি ম্যাচে পেলো ছটি গোল। অন্যদিকে আর্জেন্টিনার অনুকূলে দুটি ম্যাচে এসেছে মাত্র দুটি গোল। কাজেই এই অবস্থায় আর্জেন্টিনাকে যদি ফাইনালে পৌঁছুতে হয় তাহলে তাদের ম্যাচ জিততে হবে কমপক্ষে পাঁচ গোলে। এটা এক-রকম প্রায় অসম্ভব বলেই ধরে নিয়েছিলেন অনেকে। পেরু তো একেবারে তাচ্ছিল্য করার মতো দল নয়। ব্রাজিলিয়ানরাও মনে মনে নিশ্চিন্ত ছিলেন। অথচ সবাইকে অবাক করে দিয়ে এই ম্যাচে পেরু হারলো ৬—০ গোলে। পেরুর এই পরাজয় বিশ্বফুটবলের কাছে শুধুমাত্র বিস্ময়কর নয়, কলঙ্কেরও বটে। এই ম্যাচে বড়োসড়ো ব্যবধানে জয়ের সুবাদে গোল এ্যাভারেজ সম্বল করে ফাইনালে উঠে গেল আর্জেন্টিনা। ব্যর্থ ব্রাজিল পেরুর দিকে আঙুল

তুলে তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে সনাক্ত করলো। অভিজ্ঞ কোচ কুটিনহো বললেন—'ব্রাজিলের এই পরাজয় আমাদের স্তম্ভিত করেছে। পেরুর এই পরাজয় শুধু ফুটবলে নয়, তাদের জাতীয় চরিত্রের পরাজয়।'

লোকে যে যাই বলুক, আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা খুশী। দীর্ঘদিন বাদে তারা ফাইনালে ওঠার সম্মান পেয়েছে। এবার তাদের লড়তে হবে হল্যাণ্ডের সঙ্গে।

খ বিভাগের ফলাফল যা দাঁড়ালো, তা হলো :

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
আর্জেন্টিনা—	৩	২	০	১	৮	০	৫
ব্রাজিল—	৩	২	০	১	৬	১	৫
পোল্যাণ্ড—	৩	১	২	০	১	৫	২
পেরু—	৩	০	৩	০	০	১০	০

দুই বিভাগ থেকে শীর্ষস্থান পেয়ে হল্যাণ্ড ও আর্জেন্টিনা হলো মুখোমুখি। ফাইনালের আগে অনুষ্ঠিত হলো তৃতীয় স্থান দখলের খেলা। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হলো ব্রাজিল বনাম ইতালির মধ্যে। বলা বাহুল্য, ফাইনালের চাইতেও এই ম্যাচটি ফুটবলের উৎকর্ষতায় যথেষ্ট উচ্চমানের হয়েছিল। উভয় দলই শিল্প-সম্মত ফুটবলের পরিচয় দিয়ে ম্যাচটিকে উপভোগ্য ও দৃষ্টি-নন্দন করে তুলেছিল। এই ম্যাচে ২—১ গোলে জয় পেলো ব্রাজিল। এবার অপেক্ষা ফাইনাল ম্যাচটির জন্য।

২৫শে জুন বুয়েনস এয়ারস সাজল নতুন সাজে। চারদিক ফাইনাল ম্যাচ উপলক্ষে সাজানো হলো। পত পত করে উড়তে থাকলো আর্জেন্টিনার জাতীয় পতাকা। এই ম্যাচটি যে প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে শেষ হবে এই ধারণা সকলেরই ছিল। নিজেদের মাঠে আর্জেন্টিনা যেমন হল্যাণ্ডকে সহজে ছেড়ে দেবে না, তেমনি হল্যাণ্ড দল দ্বিতীয়বার ফাইনালে ওঠার সুবাদে নিশ্চয় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার জন্য লড়াই করবে এটাও সত্যি।

হলোও তাই।

কিক্-অফের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচ জমে উঠলো। চললো দ্রুতলয়ে খেলা। হল্যাণ্ড আক্রমণের শুরুতেই বিব্রত করে তুললো আর্জেন্টিনাকে। তাদের চকিত আক্রমণ বারবার স্তম্ভিত করে দিলো। এই দিন ইয়ং ব্লড দক্ষতা না দেখালে প্রথমার্ধেই হয়তো হল্যাণ্ড একাধিক গোলে এগিয়ে যেতো।

খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটের মাথায় বাঁ দিক থেকে হ্যানের ফ্রি-কিকে দর্শনীয়ভাবে মাথা ছোঁয়ালেন রেপ। আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডারেরা সবাই অপ্রস্তুত। দুর্ভাগ্য হল্যাণ্ডের, বলটি পোস্টে লেগে ফিরে যায়। এরপর আক্রমণে ফিরে আসে আর্জেন্টিনা। কেম্পেস, পাসারেলা অসাধারণ খেললেন। পাসারেলার একটি দর্শনীয় জোরালো শট পোস্টে প্রতিহত হলো। ফিরতি বলে শট নিলেন লুকে। এবার শেষ মুহূর্তে বলটিকে ঘুষি মেরে দিলেন ব্লড।

সাঁয়ত্রিশ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল পেলো আর্জেন্টিনা। কেম্পেস গোল দিয়ে এগিয়ে দিলেন দলকে। সুযোগ অপচয় করলেন রেনসেনব্রিঙ্ক।

দ্বিতীয়ার্ধে ঝড়ের বেগে খেলা শুরু করলো হল্যাণ্ড। জয়ের জন্য তারা বদ্ধপরিকর। এই সময় রেনেভ্যানের শট্ ফিরে এলো পোস্টে লেগে। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে। তা না হলে ফিরতি বলে হ্যান যে শটটি করেছিলেন সেটি ফিল্লোল যে কি ভাবে রক্ষা করেছিলেন তা দেখলে রোমাঞ্চিত হতে হয়। ফিল্লোল হয়তো হাজার চেষ্টা করেও এই জাতীয় শট দ্বিতীয়বার রক্ষা করতে পারবেন না। শুধু তিনি কেন যে কোনো গোলরক্ষকের কাছেই এটা ছিল একরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আসলে সময়ে সময়ে ফুটবলে এমন অকল্পনীয় কিছু ঘটে যায়, যার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত হল্যাণ্ড প্রচণ্ড লড়াই করার পর খেলায় সমতা আনলো ৮৭ মিনিটের মাথায়। কর্ককভের উঁচু সেন্টারে মাথা ছুঁয়ে গোল করলেন রেনেভ্যান।

নির্দিষ্ট সময়ের খেলা শেষ হলো। এরপর শুরু হলো অতিরিক্ত সময়ের খেলা। নাটক জমলো এই সময়। হল্যাণ্ড প্রাধান্য ফিরে পাওয়ার আশায় শুরু করলো অল আউট খেলতে। আক্রমণে তারা সবাই উঠে এলো। হল্যাণ্ড কি স্ট্যাটিজিতে ভুল করেছিল ? হয়তো। সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করলেন কেম্পেস। তিনি দলর দায়িত্ব নিয়ে আক্রমণ শুরু করলেন। এই সময় হল্যাণ্ডের ডিফেন্স বলতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না। ১৪ মিনিটের মাথায় গোল দিলেন কেম্পেস। ২—১ গোলে পিছিয়ে গেল হল্যাণ্ড। তারা এই অবস্থায় মোটেই রক্ষণাত্মক খেলায় গেল না। বরং পাল্টা আক্রমণে তারা উঠে গেল। ক্রুয়েফ মাঝপথে ফাঁসবন্দী হয়ে ছটফট করছিলেন। সময় শেষ হয়ে আসছে দেখে মেজাজ হারাতে লাগলো হল্যাণ্ড দল। এই সুযোগে চমৎকার বোঝা-

পড়ার মধ্যে আক্রমণে গিয়ে তৃতীয় গোলটি দিলেন বার্তোনি। এই গোলের সুবাদেই হল্যাণ্ডের স্বপ্ন ব্যর্থ করে চ্যাম্পিয়ান হয়ে গেল আর্জেন্টিনা।

আটত্তরের আসর শেষ হলো। এই আসরের কিছু পরিসংখ্যানের দিকে আমাদের এবার নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই আসরে মোট খেলোয়াড়ের সংখ্যা ছিল ২৫৭ জন। বদলি খেলোয়াড়ের সংখ্যা ছিল ৭১ জন। আসরে সবচেয়ে বেশী খেলোয়াড় মাঠে নামিয়েছিল ফ্রান্স। তাদের হয়ে অংশ নিয়েছিল বিশ্বকাপে মোট ২২ জন। বলা বাহুল্য এই আসরে বিশ্বকাপের এক হাজার গোল সম্পূর্ণ হয়। এই হাজারতম গোলটি করেন হল্যাণ্ড দলের রেনসেনব্রিঙ্ক। ব্রিঙ্কসের সহস্রতম বিশ্বকাপের গোলকে স্মরণীয় করার জন্য একটি স্মারক টিকিট বাজারে ছাড়া হয়েছিল। এই গোল রেনসেনব্রিঙ্ক দিয়েছিলেন স্কট দলের বিরুদ্ধে পেনাল্টি থেকে। পরিশেষে বলি এই আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেয়েছিলেন আর্জেন্টিনার কেম্পেস। তিনি দিয়েছিলেন মোট ৬টি গোল।

আর্জেন্টিনার আসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয় পরবর্তী ৮২ সালের আসর বসবে স্পেনে।

এবার আমাদের পাতা উল্টে প্রবেশ করতে হবে চার বছর ব্যবধানে 'এস্পেনা—৮২'তে। চল স্পেন।

এসপেনা—৮২

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ভূমি স্পেন। শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে পেশাদার ফুটবলের তীর্থভূমি। বিরাশিতে আয়োজনকারী দেশের সম্মান পেয়ে গোটা স্পেন নতুন সাজে সজ্জিত হলো। চারদিক সুসজ্জিত হলো বিভিন্ন চিত্রকলায়। গোটা শহর সাজানো হলো নতুন করে।

স্পেনের আসরে বেশ কিছু রীতিনীতির পরিবর্তন হতে দেখা গেল। প্রতিবারের মতো ষোলোটি দেশকে না নিয়ে এবার চব্বিশটি দেশকে নিয়ে শুরু হলো বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্বের আয়োজন। ফলে এতোগুলি ফুটবল দেশ স্পেনে উপস্থিত হওয়ায় বিরাট এক মহোৎসবের ব্যাপক আয়োজন শুরু হলো। স্পেনের কর্তারা এই প্রথম সমস্ত খেলাগুলিকে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন।

সারা দেশের চোদ্দোটি শহরের আঠারোটি ষ্টেডিয়ামে খেলাগুলি সমানভাবে অনুষ্ঠিত হলো। ঠিক হলো রাজধানী মাদ্রিদ হবে প্রতিযোগিতার মূল কেন্দ্রস্থল।

স্পেনের মূল পর্বের আসরে খেলার সুযোগ পেলো না হল্যাণ্ড। বিস্ময়কর ভাবে এবার তারা ছিটকে গেল প্রতিযোগিতা থেকে। আবার বিপরীত দিকে এই আসরে অংশ নিতে দেখা গেল নবাগত বেলজিয়াম, আলজেরিয়া, হণ্ডুরাস ও কুয়েতকে।

যে চব্বিশটি দল প্রাথমিক বিভাগে যোগ দিয়েছিল তাদের ভাগ করা হয়েছিল ছটি বিভাগে। প্রতি বিভাগে ছিল চারটি করে দল। ঠিক হয় প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি বিভাগে লীগ ভিত্তিক খেলার পর, প্রথম দুটি করে দল নিয়ে মোট বারোটি দলের মধ্যে শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা। দ্বিতীয় পর্যায়ে চারটি গ্রুপে বারোটি দলকে খেলানো হবে। এবং খেলা শেষে প্রতি দলের চ্যাম্পিয়ানদের নিয়ে হবে সেমি-ফাইনালের খেলা।

এবার দেখা যাক কোন গ্রুপে কোন কোন দল অংশ নিয়েছিল ঃ

এক নম্বর গ্রুপে ছিল—ইতালি ক্যামারুণ, পোল্যাণ্ড ও পেরু।

দুই নম্বর গ্রুপে ছিল—পঃ জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, চিলি ও আলজিরিয়া।

তিন নম্বর গ্রুপে ছিল—আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, হাঙ্গেরী ও সালভাদর।

চার নম্বর গ্রুপে ছিল—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, চেক ও কুয়েত।

পাঁচ নম্বর গ্রুপে ছিল—যুগোশ্লাভ, ফ্রান্স, স্পেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড।

ছয় নম্বর গ্রুপে ছিল—ব্রাজিল, রাশিয়া, স্কটল্যাণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ড।

১৩ই জুন বার্সিলোনার নিউক্যাম্প ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো উদ্বোধনী আসর। বর্ণাঢ্য মুখর পরিবেশের মধ্যে নিউক্যাম্প ষ্টেডিয়ামে মিলিত হলো গত বছরের চ্যাম্পিয়ান আর্জেন্টিনার সঙ্গে নবাগত বেলজিয়াম। এই ম্যাচ সম্পর্কে ক্রীড়ামোদীদের কোনো রকম উৎসাহ ছিল না। সবাই জানতেন এই ম্যাচে আর্জেন্টিনা সহজে জয় পেয়ে যাবে। তবু এই ম্যাচ দেখার জন্য মাঠে হাজির থাকলেন প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশী দর্শক।

স্পেনের বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী আসরে প্রথম অঘটন ঘটালো বেলজিয়াম। এই ম্যাচে তারা পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ফুটবল দেশকে চকিতে গোল দিয়ে

সহজে ম্যাচ জিতে গেল। প্রায় চল্লিশ গজ দূর থেকে একটি চমৎকার শটে গোল করলেন ভাণ্ডারবার্গ। তাঁর গোলে হতচকিত আর্জেন্টিনা দল প্রথম ম্যাচেই হেরে যেতে বাধ্য হলো। আর্জেন্টিনার কোচ মেনোত্তি ভাণ্ডারবার্গের এই গোল নিয়ে প্রতিবাদ করলেও তাঁর সেই প্রতিবাদ ধোপে টিঁকলো না। দূরদর্শনের পর্দায় পরিষ্কার বোঝা গেলো গোলটি ভাণ্ডারবার্গ বৈধভাবেই দিয়েছেন।

উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হয় তিন নম্বর গ্রুপের খেলা দিয়ে। কাজেই আমাদের আলোচনায় তিন নম্বর গ্রুপের কথাই প্রথম আরম্ভ করেছি। প্রথম ম্যাচে বেলজিয়ামের কাছে ধাক্কা খাওয়া আর্জেন্টিনা পরের দুটি ম্যাচে নিজেদের সামলে নিলো। কোনোক্রমে তারা জয় পেলো হাঙ্গেরী ও সালভাদর দলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে বেলজিয়াম পরের ম্যাচে আবার কঠিন লড়াই করে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিলো হাঙ্গেরীর কাছ থেকে। ম্যাচ শেষ হলো ১—১ গোলে। শেষ ম্যাচেও তারা সালভাদরকে হারালো ১—০ গোলে। এই গ্রুপে হাঙ্গেরী শক্তিহীন সালভাদরকে ১০টি গোল দিয়েও নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারলো না। আর্জেন্টিনার কাছে হেরে যাওয়ায় তাদের প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে হলো।

তিন নম্বর গ্রুপের ফলাফল দাঁড়ালো এই রকম ঃ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
বেলজিয়াম—	৩	২	০	১	৩	১	৫
আর্জেন্টিনা—	৩	২	১	০	৩	২	৪
হাঙ্গেরী—	৩	১	১	১	১২	৬	৩
সালভাদর—	৩	০	৩	০	২	১৩	০

এবার আসা যাক এক নম্বর গ্রুপের কথায়। এই গ্রুপে ইতালি ছিল ফেভারিট। কিন্তু প্রথম দুটি ম্যাচে ইতালি রক্ষণাত্মক ফুটবলের পরিচয় দিলো। তাদের খেলা দেখে মনে হলো তারা যেন জয়ের জন্য খেলতে নারাজ। মাঠে নেমেছে কোনোরকমে ম্যাচ বাঁচাবার জন্য। অন্যদিকে ক্যামারুণ ও পোল্যাণ্ড একই ভূমিকা নিলো। জয়ের ইচ্ছা এই গ্রুপে কোনো দলেরই ছিল না। ইতালি প্রথম দুটি ম্যাচ ড্র করায় সবাই ভেবেছিল হয়তো তারা শেষ ম্যাচ জেতার

জন্য খেলবে। কিন্তু সেরকম উৎসাহ তাদের খেলায় ধরা পড়লো না। শেষ ম্যাচ তারা ক্যামারুণের সঙ্গে শেষ করলো ১—১ গোলে। অন্যদিকে পোল্যাণ্ড গ্রুপ লীগের শেষ খেলায় পেরুকে ৫—১ গোলে বিধ্বস্ত করে পেলো শীর্ষ স্থান। ইতালি ও ক্যামারুণ দল খেলা শেষ করলো একই পয়েণ্টে। কেবল মাত্র গোল এ্যাভারেজ সম্বল করে অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় ইতালি পেলো দ্বিতীয় দল হিসাবে দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ।

দুই নম্বর গ্রুপে ফেভারিট পশ্চিম জার্মানী বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়ে ম্যাচ হেরে বসলো আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে যোগ্য দল হিসাবেই জয় পেয়েছিল আলজিরিয়া। প্রথম ম্যাচে ধাক্কা খাওয়া জার্মানীরা তাই পরের ম্যাচগুলিতে সতর্ক হলো। দ্বিতীয় ম্যাচে তারা মরিয়া হয়ে খেললো চিলির বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে জার্মানীকে নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়ক রুমানিগে। তিনি একাই নিলেন দলের মুখ্য ভূমিকা। এইদিন রুমানিগে শুধু একক প্রচেষ্টায় দলকে বড়োসড়ো ব্যবধানে জয় এনে দিলেন না, সেই সঙ্গে করলেন একটি মনোরম হ্যাটট্রিক। বিরাশির বিশ্বকাপে এটাই ছিল দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। প্রথম হ্যাটট্রিক করেছিলেন হাঙ্গেরীর লাজলোকিস্। আলজিরিয়া দ্বিতীয় ম্যাচে পেরুকে সহজে হারালো। কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে শেষ ম্যাচে তারা একটি পয়েণ্ট ছিনিয়ে নিলো অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে। ফলে এই গ্রুপের শেষ খেলাটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন ছিল জার্মান দল কি দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছুতে পারবে?

আলজিরিয়া সম্পর্কে একরকম প্রায় সবাই নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু এইদিন ফুটবলকে কলঙ্কিত করে গড়াপেটার খেলা খেললো ইউরোপের দুটি দেশ। তাদের গড়াপেটা খেলার চেহারা দেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়লো আলজিরিয়ার সমর্থকেরা। তারা স্লোগান দিলো—'ইট ইজ নট এ ফুটবল'।

জার্মানী ম্যাচে জয় পেলো ১—০ গোলে। ফলে তারা পেলো শীর্ষস্থান। দ্বিতীয় স্থান পাওয়ার যোগ্যতা পেলো গোল এ্যাভারেজে অষ্ট্রিয়া। আশাহত হলো আলজিরিয়া। তাদের তরফ থেকে চরম প্রতিবাদপত্র দেওয়া হলো ফিফা কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু তারা এই ব্যাপারে মৌখিক নিন্দা প্রকাশ করলেও কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না।

এই বিভাগে ফলাফল দাঁড়ালো যথাক্রমে ঃ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পশ্চিম জার্মানী—	৩	২	১	০	৬	৩	৪
অষ্ট্রিয়া—	৩	২	১	০	৩	১	৪
আলজিরিয়া—	৩	২	১	০	৫	৫	৪
চিলি—	৩	০	৩	০	৩	৮	০

পাঁচ নম্বর বিভাগে প্রথম ম্যাচে সংগঠনকারী দেশ স্পেন জয় পেলো পেনাল্টিতে। এই পেনাল্টি নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। হণ্ডুরাস কমজোরী দেশ হলেও তারা এই ম্যাচে অসাধারণ লড়াই করেছিল। এই গ্রুপে ফেভারিট ছিল অভিজ্ঞ যুগোশ্লাভ দল। কিন্তু তারা প্রথম ম্যাচেই থমকে গেল উত্তর আয়ারল্যাণ্ড দলের কাছে। ম্যাচ শেষ হলো গোলশূন্য-ভাবে। পরের ম্যাচ স্পেনের বিরুদ্ধে। খেলাটি খুব একটা উচ্চাঙ্গের হলো না। এক গোলে এগিয়ে থাকা যুগোশ্লাভ শেষ দিকে ম্যাচ ছেড়ে দিলো। তাদের ম্যাচ থেকে আগ্রহ কমে যাওয়ার কারণ হলো পেনাল্টির সিদ্ধান্ত। স্পেন পর পর দুটি ম্যাচে একরকম রেফারির বদান্যতায় পয়েন্ট সংগ্রহ করলো। যুগোশ্লাভ শেষ দিকে ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ায় শেষ মুহূর্তের গোলে জয় পেয়ে গেলো স্পেন। কিন্তু পরের ম্যাচে তাদের হারতে হলো আয়ার-ল্যাণ্ডের কাছে। এই বিভাগে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড দুটি ম্যাচে জয় পেয়ে পেলো শীর্ষস্থান। এই বিভাগে গোল এ্যাভারেজে দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেলো স্পেন দল।

এই বিভাগের ফলাফল দাঁড়ালো ঃ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
উত্তর আয়ারল্যাণ্ড—	৩	২	০	১	২	১	৫
স্পেন—	৩	১	১	১	৩	৩	৩
যুগোশ্লাভ—	৩	১	১	১	২	১	৩
হণ্ডুরাস—	৩	০	২	১	৩	৪	১

চার নম্বর গ্রুপে একমাত্র ইংল্যাণ্ড জিতলো সব কটি খেলায়। দলগত ঐক্যের চরম সাফল্য দেখে বৃটিশ সমর্থকেরা সবাই খুশী হলেন। ইংল্যাণ্ড প্রথম ম্যাচেই ৩—১ গোলে শোচনীয়ভাবে হারালো ফ্রান্সকে। এই বিভাগে

নবাগত কোয়েত দল প্রথম ম্যাচে চমক দিল ইউরোপীয় ফুটবল-সমর্থকদের। চেক দলের মতো একটি শক্তিশালী দলকে তারা রুখে দিল। কিন্তু প্রথম ম্যাচে ভালো খেলে কোয়েত পরের ম্যাচগুলিতে তাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলো না। দ্বিতীয় ম্যাচে তারা হার স্বীকার করলো ইংল্যাণ্ডের কাছে। শেষ ম্যাচে ফ্রান্স তাদের বিধ্বস্ত করলো ৪—১ গোলে। অন্যদিকে ফ্রান্স শেষ ম্যাচে প্রচণ্ড লড়াই করে ম্যাচ শেষ করলো ১—১ গোলে। ফলে এই বিভাগ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলার যোগ্যতা পেলো ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স।

এই বিভাগের ফলাফল দাঁড়ালো ঃ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইংল্যাণ্ড—	৩	৩	০	০	৬	১	৬
ফ্রান্স—	৩	১	১	১	৬	৫	৩
চেক—	৩	০	১	২	২	৪	২
কোয়েত—	৩	০	২	১	২	৬	১

ছয় নম্বর গ্রুপে ব্রাজিল যে শীর্ষস্থান পাবে এই বিষয়ে কারো মনে কোনো-রকম সন্দেহ ছিল না। তবে দ্বিতীয় স্থান কে পাবে তা নিয়ে বাজার দর উঠেছিল চরমে। স্কটল্যাণ্ড চিরকালই লড়িয়ে দল। কাজেই তারা যে সহজে ছেড়ে দেবে এমন নয়। এবারের আসরে সোভিয়েত তৈরী হয়েই এসেছিল। তারাও শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। সোভিয়েত দলকে প্রথমেই মোকাবিলা করতে হলো ব্রাজিলের সঙ্গে। ম্যাচটি প্রচণ্ড উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। খেলার ৩৩ মিনিটের মাথায় সোভিয়েত দল প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে গেল। এর পর সারাক্ষণ ম্যাচটি চললো আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের মধ্যে। পিছিয়ে পড়া ব্রাজিল গোল শোধ করার জন্য শেষ মুহূর্তে মরিয়া হয়ে উঠলো। গোটা দল উঠে এলো ওপরে—এ্যাটাকিং ফুটবলের আদর্শ নজির গড়ে ৭৩ মিনিটের মাথায় গোল শোধ করলেন অধিনায়ক সক্রেটিস। তাঁর জোরালো সোয়াভিং শট সোভিয়েত গোলরক্ষককে স্তম্ভিত করে দিলো। সক্রেটিসের এই গোল গোটা দলকে উজ্জীবিত করলো নতুন প্রেরণায়। এরপর দ্বিতীয় গোল করলেন এডগার। গোলটি অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন হয়েছিল। বক্সের বাইরে থেকে জিকোর থ্রু পাশে একজন ফলস্

দিলে পিছন থেকে উঠে আসা এডগার গোলে শট নিলেন। শেষ পনেরো মিনিটে দুটি চমৎকার গোল দিয়ে জয় পেয়ে গেল ব্রাজিল। পরের দুটি ম্যাচেও সহজে জয় পেলো ব্রাজিল। স্কট দলের বিরুদ্ধে প্রথম গোল দিলেন জিকো। তবে তাঁর এই গোলটি দেওয়ার আগেই স্কট দল প্রথম গোলটি করে যায় ১৮ মিনিটের মাথায়। ব্রাজিল আক্রমণে উঠে যাওয়ায় ফাঁকায় বল পেয়ে যান নায়ডান। তিনি স্কট দলের হয়ে প্রথম গোল করেন। জিকোর গোল ৩৩ মিনিটে সমতা আনলো। এরপর পর পর তিনটি গোল দিলেন এডগার, ওসকার ও ফালকাও। এই ম্যাচে দুটি পয়েন্ট ঘরে তোলায় ব্রাজিল একরকম প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। শেষ ম্যাচে নিউজিল্যাণ্ডকে তারা হারালো সরাসরি ৪—০ গোলে। এই ম্যাচে শতাব্দীর একটি সেরা গোল দিলেন জিকো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোল করলেন এডগার এবং শেষ গোলটি করলেন ফালকাও। দ্বিতীয় স্থান দখল করার জন্য সোভিয়েত দলকে লড়াই করতে হলো। তারা নিউজিল্যাণ্ডকে হারালো ৩—০ গোলে। গোলের এই ব্যবধানের জন্য সোভিয়েত পেয়ে গেল গোল এ্যাভারেজে দ্বিতীয় স্থান। শেষ ম্যাচটি স্কটের সঙ্গে শেষ হলো ২—২ গোলে।

লীগের ফলাফল দাঁড়ালো ৬ নম্বর বিভাগে ঃ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ব্রাজিল—	৩	৩	০	০	১০	২	৬
সোভিয়েত—	৩	১	১	১	৬	৪	৩
স্কটল্যাণ্ড—	৩	১	১	১	৮	৮	৩
নিউজিল্যাণ্ড—	৩	০	৩	০	২	১২	০

বলা বাহুল্য প্রথম পর্যায়ের লীগে একমাত্র তিনটি ম্যাচে জয়ের মুখ দেখতে পেলো ব্রাজিল ও ইংল্যাণ্ড। প্রথম পর্যায়ের লীগে সর্বসাকুল্যে গোল হলো ১০১টি। দলগত সর্বাধিক গোল পেলো হাঙ্গেরী—বারোটি। এই বারোটি গোলের মধ্যে এক সালভাদর দলকে তারা দিয়েছিল দশটি গোল। ব্রাজিল তিনটি ম্যাচে পেলো দশটি গোল।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় পর্যায়ের কথায়। এই পর্যায়ের খেলায় ছটি বিভাগ থেকে প্রথম দুটি করে দল নিয়ে মোট বারোটি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত

হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা। বারোটি দলকে ভাগ করা হলো চারটি বিভাগে।

ক বিভাগে থাকলো পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সোভিয়েত।

খ বিভাগে থাকলো পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, স্পেন।

গ বিভাগে থাকলো ইতালি, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল।

ঘ বিভাগে থাকলো উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স।

দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা শুরু হলো প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে। শুরুতেই ক বিভাগে অঘটন ঘটলো। যে বেলজিয়াম প্রথম পর্যায়ের লীগে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বাতাস গরম করে তুলেছিল সেই তারা সরাসরি ৩—০ গোলে হেরে বসলো পোল্যাণ্ডের কাছে। এই ম্যাচে পোলাণ্ড তাদের দাঁড়াতেই দিলো না। বোনিয়েক একাই দিলেন তিনটি গোল। এটি হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় প্রথম হ্যাটট্রিক। প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়া পোল্যাণ্ড দ্বিতীয় ম্যাচ জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে মাঠে নামলো। এইদিন পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েতের তুমুল লড়াই হলো। ৯০ মিনিট বল এ গোল থেকে ও গোলে ছুটে গেলেও কাজের কাজ কিছুই হলো না। খেলা শেষ হলো অমীমাংসিত ভাবে। প্রথম ম্যাচে জয় না পাওয়া সোভিয়েত দ্বিতীয় ম্যাচে বেলজিয়ামকে বড়োসড়ো ব্যবধানে হারাবার জন্য মাঠে নামলো। পোল্যাণ্ড আগেই তিন গোল দিয়ে এগিয়ে ছিল। এমত অবস্থায় সোভিয়েতকে সেমি-ফাইনালে পৌঁছুতে গেলে প্রয়োজন ছিলো বেলজিয়ামকে কমপক্ষে চার গোল দেওয়া। প্রচণ্ড লড়াই করা সত্ত্বেও সোভিয়েত দলের ফরোয়ার্ডেরা পারলেন না একটির বেশী দ্বিতীয় কোনো গোল করতে। ফলে এই ম্যাচে ১—০ গোলে জয় পাওয়ায় প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যেতে হলো সোভিয়েত দলকে। সেমি-ফাইনালে উঠে গেল পোল্যাণ্ড।

খ বিভাগের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলেন ফুটবল প্রেমীর দল। যে ইংল্যাণ্ড প্রথম পর্যায়ের খেলায় তিনটি ম্যাচেই জয় পেয়েছিল সেই তারাই এবার ছুটি ম্যাচের মধ্যে কোনো একটিতেও জয়ের মুখ দেখতে পেলো না। পশ্চিম জার্মানী ও স্পেন এই দুই দলের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড খেলা শেষ করলো গোলশূন্য ভাবে। ফলে শেষ ম্যাচে পশ্চিম জার্মানী স্পেনকে ২—১ গোলে হারানোর সুবাদে উঠে গেল সেমি-ফাইনালে। ইংল্যাণ্ডের

দুর্ভাগ্য এবারের আসরে তারা একটি ম্যাচে না হেরেও প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হলো।

গ বিভাগে গতবারের চ্যাম্পিয়ান আর্জেন্টিনা দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হলো। তাদের সুপার-ষ্টার মারাদোনা ভালো খেলতে পারলেন না। বরং এই বিভাগে ইতালি চমক তুললো। প্রথম পর্যায়ের খেলার তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা অভাবনীয় ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিলো। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে রক্ষণাত্মক ইতালি জয় পেয়ে গেলো ২—১ গোলে। গোল দিলেন মার্কোতারাডলি ও আণ্টনিও ক্যাব্রিনি। আর্জেন্টিনার পক্ষে একটি মাত্র গোল করলেন পাসারেলা।

আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচে হেরে যাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল। ফলে এই মানসিক দুর্বল আর্জেন্টিনাকে ঝড়ের বেগে খেলে ম্যাচ হারাতে কোনোরকম কষ্ট হলো না ব্রাজিলের। তারা ম্যাচ জিতলো ৩—১ গোলে। গোল করলেন জিকো, সার্জিনহো ও জুনিয়র। আর্জেন্টিনার পক্ষে একমাত্র গোল দিলেন দিয়াজ।

এই বিভাগের শেষ খেলা অনুষ্ঠিত হলো ব্রাজিল বনাম ইতালির মধ্যে। এই ম্যাচে ব্রাজিলের জয়ের প্রয়োজন ছিল না। তারা কোনোরকমে এই ম্যাচ ড্র রাখতে পারলেই সেমি-ফাইনালে ওঠার সুযোগ পাবে—এই ছিল অবস্থা। কাজেই সবাই ধারণা করে নিলো এই বিভাগ থেকে ব্রাজিল অনায়াসে সেমি-ফাইনালে উঠবে। কিন্তু আশ্চর্য—তা হলো না। ফুটবল খেলাতেও যে সময় সময় অঘটন ঘটে তার প্রমাণ মিললো এই ম্যাচে। ব্রাজিলের ঝড়ো আক্রমণের সামনে নিখুঁত কায়দায় ফুটবল খেলে ইতালি সবাইকে চমকে দিলো। এই ম্যাচে মনে হয় ফুটবলের দেবতা ভর করে-ছিলেন পাওলো রোসির ওপর। সুযোগ সন্ধানী রোসি ব্রাজিল রক্ষণভাগের ফাঁক গলে একাই দিলেন তিন-তিনটি গোল। ব্রাজিল গোল খেয়ে পর পর দুবার খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনলো। দ্বিতীয় গোল ফালকাও শোধ করার পরও ব্রাজিল রক্ষণাত্মক ভূমিকা না নিয়ে উঠে গেল আক্রমণে। তাদের এই আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে ইতালি রক্ষণভাগ যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিলো। শেষ মুহূর্তে ব্রাজিল যখন গোলের প্রত্যাশায় ইতালির সীমানার মধ্যে ঘুর

ঘুর করছিল ঠিক তখনই কিভাবে যেন একটি বল ছিটকে চলে এসেছিল অরক্ষিত রোসির কাছে। বুদ্ধিমান রোসি গোল করতে ভুল করলেন না। এই গোলের সুবাদেই ইতালি দুটি খেলায় চার পয়েন্ট পেয়ে উঠে গেল সেমি-ফাইনালে। ব্যর্থ হলো ব্রাজিল। যে ম্যাচটিতে তারা অতিমাত্রায় রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে অনায়াসে সেমি-ফাইনালে উঠে যেতে পারতো, সেই খেলায় তারা অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হওয়ায় ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলো। ব্রাজিল যে এইভাবে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাবে, এমন কল্পনা কেউই করে নি।

ঘ বিভাগে অষ্ট্রিয়ার পক্ষে বাজার দর থাকলেও ফ্রান্স দ্বিতীয় পর্যায়ে অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিলো। দুটি ম্যাচেই তাদের জয় হলো। অন্যদিকে ফেভারিট অষ্ট্রিয়া প্রথম ম্যাচ ফ্রান্সের কাছে হারার পর দ্বিতীয় ম্যাচে ড্র করে বসলো আয়ারল্যাণ্ড দলের কাছে। ফলে এই বিভাগ থেকে সেমি-ফাইনালে উঠলো ফ্রান্স। তারা দুটি ম্যাচে দিলো পাঁচটি গোল।

চারটি বিভাগ থেকে এবার শীর্ষস্থান অধিকারী চারটি দল মিলিত হলো সেমি-ফাইনালে।

একই দিনে অনুষ্ঠিত হলো দুটি সেমি-ফাইনাল খেলা। প্রথম সেমি-ফাইনালে মিলিত হলো ইতালি ও পোল্যাণ্ড। এই ম্যাচটিকে ঘিরে বাজির দর উঠেছিল সপ্তমে। যদিও ফেভারিট ছিল ইতালি। যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা বললেন—'ইতালি তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলাগুলিতে যেভাবে তাদের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে খেলে জয় পেয়েছে, তাতে তাদের পক্ষে পোল্যাণ্ডকে হারানো খুব একটা কঠিন হবে না।'

এই ম্যাচে পোল্যাণ্ডের ডিফেনডারেরা মনে হয় প্রতিজ্ঞা করে মাঠে নেমে-ছিলেন যে তারা কেউই পাওলো রোসিকে নিজেদের রক্ষণসীমানার মধ্যে বল ছুঁতে দেবেন না। সেই মতো তারা রোসিকে কড়া পাহারায় রেখেছিলেন। অথচ আশ্চর্য—এতো কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও রোসি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে স্বল্প প্রয়াসে দু-দুটি গোল দিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর প্রথম গোলটির তুলনায় দ্বিতীয় গোলটির মধ্যে ছিল বুদ্ধিমত্তার ছাপ। দেখে মনে হয়েছিল রোসি আগে থেকেই জানতেন তারাদলির নিখুঁত সেন্টারটি বাঁ দিক

দিয়ে তাঁর মাথায় এসে পৌঁছুবে। সেই মতো তিনি সকলকে ফাঁকি দিয়ে ঠিক সময় সরে এসেছিলেন গোল সীমানার মধ্যে। ফলে বলটিকে মাথা দিয়ে ছোঁয়াতে তাঁর কোনোরকম অসুবিধে হয় নি। ব্যাপারটা পোল্যাণ্ড ডিফেন-ডারেরা যখন বুঝলো, ততোক্ষণে বলটি জড়িয়ে গেছে জালে—তাদের আর কিছু করণীয় নেই। রোসির দেওয়া দুটি দর্শনীয় গোলের বিনিময়ে ইতালী অনায়াসে উঠে গেল ফাইনালে। স্পেনের বিশ্বকাপে দস্তুর মতো আতঙ্কের সৃষ্টি করলেন রোসি। দুটি ম্যাচে তিনি দিলেন পাঁচটি গোল। রোসির দক্ষতা নতুন করে ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিলো কয়েক বছর ফুটবলের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেও তাঁর ফর্ম আগের মতোই আছে। তাঁর নির্বাচন মোটেই অযৌক্তিক হয় নি।

এই ম্যাচের পরেই অনুষ্ঠিত হলো ফ্রান্স বনাম পশ্চিম জার্মানীর খেলাটি। শতাব্দীর ফুটবলে যে কটি স্মরণীয় ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে এই ম্যাচটি হলো একটি।

বিশ্বকাপ ইতিহাসে এতোদিন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ম্যাচ হিসাবে চিহ্নিত ছিল পশ্চিম জার্মানী বনাম ইতালির সেমি-ফাইনাল ম্যাচটি। এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে। এই ম্যাচে ১২০ মিনিট লড়াই করার পর ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল ইতালির অনুকূলে। কিন্তু বিরাশির সেমি-ফাইনালে ফ্রান্স-পশ্চিম জার্মানীর ম্যাচে ১২০ মিনিটে কোনো ফলাফল সৃষ্টি হতে পারে নি। নির্দিষ্ট সময় খেলা শেষ হয়েছিল ১—১ গোলে। এরপর হয়েছিল অতিরিক্ত সময়ের খেলা। এই সময় ম্যাচের ফলাফল দাঁড়িয়েছিল ৩—৩।

অতিরিক্ত সময়ের পর খেলা হলো টাই-ভাঙ্গার পদ্ধতিতে। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে টাই-ভাঙ্গাও শেষ হলো ৪—৪ গোলে। ফলে খেলার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য গ্রহণ করা হলো সাডেন-ডেথ্ পদ্ধতি। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত জার্মানীর অনুকূলে ম্যাচ শেষ হলো ২—১ গোলে। প্রচণ্ড লড়াই করেও পরাজিত হতে হলো ফ্রান্সকে।

এই ম্যাচে ফ্রান্সের খেলোয়াড়েরা যে উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা বহুদিন স্মৃতি পটে আঁকা থাকবে একটি দর্শনীয় নজির হিসাবে। গোটা সময়ের ম্যাচে জার্মানী দলটি হয়েছিল কোণঠাসা। তারা সারাক্ষণ দেয়ালে

পিঠ দিয়ে লড়াই করলো। ফ্রান্সের দুর্ভাগ্য, তারা একতরফা ম্যাচ খেলেও নির্দিষ্ট সময়ে একটির বেশী গোল করতে পারলো না। অতিরিক্ত সময়ের খেলা চলেছিল ঝড়ের গতিতে। এই সময় মাঠে নেমেছিলেন জার্মানীর বদলী খেলোয়াড় রুমেনিগে। তিনি মাঠে নামার পর খেলার চিত্র কিছুটা বদল হল। ফ্রান্স এইদিন অতিরিক্ত সময় দুটি গোল দিয়ে ৩—১ গোলে এগিয়ে যায়। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে রুমেনিগে প্রথম গোল শোধ করলেন। এর পর খেলা চললো দ্রুত লয়ে। এই সময়ে প্লাতিনির ক্রশ-পাশ থেকে বল পেয়ে ম্যানুয়েল যে প্রচণ্ড জোরে শটটি করেছিলেন তা আশ্চর্যজনক ভাবে ক্রশ-বারে লেগে ফিরে গেল। এটাই মনে হয় ফ্রান্সের দুর্ভাগ্য। তারা এই শটটিতে গোল পেয়ে গেলে এই ম্যাচের ভাগ্য সহজেই নিষ্পত্তি হয়ে যেতো। কিন্তু তা হলো না। বরং শেষ মুহূর্তে রুমেনিগে দর্শনীয়ভাবে একটি গোল দিয়ে খেলার সমতা ফিরিয়ে আনলেন। ফলাফল দাঁড়ালো ৩—৩।

এর পর শুরু হলো টাই-ভাঙ্গার খেলা। প্রথম শটটির থেকে গোল করে ফ্রান্স এগিয়ে গেল। গোল এলো না পশ্চিম জার্মানীর উল্লি স্টিয়েলির শট থেকে। ফলে জার্মানী পিছিয়ে গেল। কিন্তু এর পরই পরপর দুটি শট অপচয় করলেন ফ্রান্সের খেলোয়াড়েরা। এই পর্যায়ের খেলা শেষ হলো ৪—৪ গোলে। ফলে শুরু হলো "সাডেন-ডেথ্" পদ্ধতি। এই পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত জয় পেলো জার্মানী। ফুটবল যে স্ট্যামিনার খেলা, বড়ো ম্যাচ জিততে গেলে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তার প্রমাণ আবার নতুন করে দিলো পশ্চিম জার্মানীর খেলোয়াড়েরা। ম্যাচ শেষে পশ্চিম জার্মানীর ভাগ্য নির্ধারণ-কর্তা হিসাবে নির্বাচিত হলেন রুমেনিগে। পরাজিত ফরাসীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। দর্শকেরা অভিনন্দিত করলেন তাদের। ম্যাচ শেষে পণ্ডিতের দল বললেন—'এটি শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ ম্যাচ। এই ম্যাচ ফুটবলের শিল্প নৈপুণ্যের উৎকর্ষতায় বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

এই জয়ের সুবাদে পশ্চিম জার্মানী উঠলো ফাইনালে। এবার তাদের মিলিত হতে হলো ইতালির সঙ্গে।

বিশ্বের সেরা তিনটি ফুটবল দেশকে শেষ তিনটি ম্যাচে হারিয়ে ইতালি

যেমন বিস্ময়কর ভাবে বিশ্বকাপ আসরের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিল, তেমনি তাদের কাছে প্রত্যাশিত হয়ে উঠেছিল বিশ্বকাপ জয়। দীর্ঘদিন বাদে ইতালি আবার ফাইনালে উঠলো। এইবার নিয়ে ইতালি ফাইনালে গেল মোট চারবার। এই চারবারের মধ্যে তারা জয় পেল তিনবার। একবার অর্থাৎ ১৯৭০ সালে তারা ব্রাজিলের কাছে পরাজিত হয়েছিল মেক্সিকোর আসরে। অন্যদিকে পশ্চিম জার্মানীও মোট চারবার ফাইনালে উঠলো। এই চারবারের মধ্যে তারা জয় পেয়েছিল মাত্র দুবার।

ইতালী-জার্মানীর খেলাকে ঘিরে উত্তেজনা কম ছিল না। অনেকেই অবশ্য বলেছিলেন, এই ম্যাচে পশ্চিম জার্মানী ১৯৭০ সালে তাদের পূর্ব পরাজয়ের হয়তো বদলা নিতে চেষ্টা করবে। বিশেষ করে তারা যে ভাবে খেলেছে তাতে তাদের পক্ষে এই ম্যাচ বার করে আনাটা খুব একটা শক্ত ব্যাপার হবে না। তবু ইতালীর দিকে পাল্লা ঝুঁকেছিল একটু বেশী। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে হারাবার পর থেকেই তারা বিশ্বকাপে ফেভারিট হয়ে ওঠে। তাদের দলগত ঐক্য ছিল অসাধারণ। বিশেষ করে ইতালির শক্ত ডিফেন্স নজর কেড়ে নিয়েছিল সকলের। হলোও তাই। ম্যাচ শুরু হওয়ামাত্র তেড়ে-ফুঁড়ে আক্রমণ শুরু করলো পশ্চিম জার্মানী। তাদের খেলার ধরন দেখে মনে হলো তারা যেন বিশ্বকাপ জয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়েই মাঠে নেমেছে। হার মানতে তারা রাজি নয়। রুমেনিগে, ব্রাইটনার, ফিশার অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মাঝমাঠ থেকে উঠে গেলেন আক্রমণে। একের পর এক আক্রমণে তাঁরা বিধ্বস্ত করে তুললেন ইতালীর রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের। পাক্কা কুড়ি মিনিট ধরে চললো জার্মানীদের এক তরফা বোমারু আক্রমণ। প্রচণ্ড চাপের মুখে কিন্তু ইতালীর রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা মেজাজ হারালো না। তারা ঠাণ্ডা মাথায় দলের পতন রোধ করলো। এই সময় হঠাৎ করেই ফাঁকায় একটা বল পেয়ে গেলেন কন্টি। তিনি আক্রমণমুখী জার্মান ডিফেন্সকে একেবারে অপ্রস্তুতে ফেলে সোজা ঢুকে পড়লেন বিপদ সীমানার মধ্যে। উপায়ান্তর না পেয়ে কন্টিকে পিছন থেকে ল্যাঙ্ মেরে ফেলে দেওয়া হলো। ফলে ব্রাজিলিয়ান রেফারি ইতালির অনুকূলে বাজালেন পেনাল্টির বাঁশি। শট নিতে এলেন ক্যাব্রিনি। দুর্ভাগ্য তাঁর—এইদিন তিনি ইতালীর

রক্ষণভাগকে বুক দিয়ে রক্ষা করেও গোল করার সহজতম সুযোগ অপচয় করার জন্য সমালোচিত হলেন। পেনাল্টির সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় অনেকেই মনে করে নিয়েছিলো ইতালিয়ানরা হয়ত মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়বে। তা কিন্তু হলো না, বরং দ্বিতীয়ার্ধে ইতালি রক্ষণাত্মক মেজাজকে ঝেড়ে ফেলে নব উদ্যোমে শুরু করলো আক্রমণ। বেশ কয়েকটি আক্রমণ নষ্ট হওয়ার পর ধৈর্যবান জেন্টল একক প্রয়াসে একটি বল টেনে নিয়ে গেলেন জার্মানী সীমানার মধ্যে। তাঁর নিখুঁত নিচু সেন্টারে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে সেই বলে মাথা ছুঁয়ে গোল করে গেলেন রোসি। মাঠ শুদ্ধু দর্শকেরা অবাক। যে রোসিকে এতক্ষণ কারো নজরে পড়ে নি, সেই রোসি কোথা থেকে এসে এমন একটি কাণ্ড ঘটিয়ে গেলেন। এই গোলের পরেই আবার একটি দর্শনীয় গোল দিলেন তারাদলি। পর পর দুটি গোল দিয়ে ইতালী অতি সহজে ম্যাচটি পকেটে পুরে নিলো। যদিও জার্মান ফরোয়ার্ডেরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখলেন না, তবু তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না ইতালির রক্ষণভাগের মধ্যে কোনোরকম ফাটল তৈরী করা। খেলা শেষ হওয়ার সাত মিনিট আগে ব্রিটনারের একটি চমৎকার শটে গোল পেলো পশ্চিম জার্মানী। ব্যবধান কমে এলেও পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ততোক্ষণে। তিনটি গোল শোধ করে ম্যাচ জেতা যে পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে সহজ হবে না এটা সবাই পরিষ্কার বুঝেছিলেন। এই ম্যাচে জার্মানী নায়ক রুমেনিগে গোল করতে না পারায় বিরাশির বিশ্বকাপে সেরা গোল-দাতার সম্মান পেলেন রোসি। তিনি শেষ চারটি ম্যাচে মোট ৬টি গোল দিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেলেন, সেই সঙ্গে নির্বাচিত হলেন টুর্ণামেন্টের সেরা খেলোয়াড়। ৩—১ গোলে জয়ের সুবাদে ইতালি পেলো ফিফা কাপ।

এই আসরে মোট ৫২টি খেলায় গোল হলো ১৪৬টি। পাওলো রোসি বিশ্বের সাংবাদিকদের ভোটে নির্বাচিত হলেন বছরের সেরা খেলোয়াড়। তার পক্ষে ভোট পড়েছিল মোট ৪৩৭টি।

স্পেনের বর্ণময় আসর শেষ হলো। এই আসর শেষে ঠিক হলো আগামী ৮৬ সালের বিশ্বকাপ আসর বসবে মেক্সিকোয়।

মেক্সিকোয় মারাদোনা সম্রাট : (১৯৮৬)

১৯৮৬।

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব ফুটবলের সেরা আসর। ১৯৭০ সালে প্রথমবার বিশ্বকাপ আসর মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় বিস্তর আপত্তি তুলেছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের দল। তারা কারণ দর্শিয়ে বলেছিলেন, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেশী ওপরে অবস্থিত কোনো অঞ্চলে সমতলভূমির মানুষজনের পক্ষে অতি মাত্রায় ছোটাছুটি করা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ এতোটা উচ্চতায় ছোটাছুটি করলে রক্তের চাপ যেমন কমে যায়, তেমনি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেও অসুবিধে দেখা যায়। ইউরোপ ভূ-খণ্ডের দেশগুলির জোরদার আপত্তি সত্ত্বেও ১৯৭০ সালে মেক্সিকোতে বিশ্বকাপ সাফল্যের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর সেই সাফল্যের কথা মনে রেখেই মাত্র যোলো বছরের মধ্যে মেক্সিকোতে আবার অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বকাপের ত্রয়োদশ আসর।

প্রথমে কথা ছিল ছিয়াশির আসর বসবে কলম্বিয়ায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোতার কর্তৃপক্ষের আর্থিক অসংগতি তাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিলো। এমত অবস্থায় দায়িত্ব নিতে সাগ্রহে এগিয়ে এলো মেক্সিকো সরকার। লাতিন আমেরিকার অন্য কোনো দেশ এই সময় দাবীদার ছিল না। ব্রাজিল অবশ্য এক সময় দায়িত্ব নিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা উপযুক্ত সময় দাবী প্রতিষ্ঠা না করায় মেক্সিকোর ওপর এই ভার তুলে দেওয়া হলো। ফলে মেক্সিকো হলো বিশ্বের প্রথম একটি দেশ, যেখানে বিশ্বকাপ আসর দু-দুবার অনুষ্ঠিত হলো।

তবু বাধা যে পড়ে নি তা নয়, আসর শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের কবলে পড়েছিল মেক্সিকোবাসী। এই ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পের ফলে পঞ্চাশ হাজার মানুষ হলো গৃহহীন। এমত অবস্থায় অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো এতোবড়ো একটা অর্থ-যজ্ঞের দায়িত্ব মেক্সিকো সরকার নিতে রাজী হবেন না। কিন্তু নিজেদের দায়িত্ব থেকে তারা সরে যেতে রাজী হলেন না। বরং তারা পরিষ্কার ভাবে বললেন—'এই বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যে

আত্মবিশ্বাসে মাথা তুলে দাঁড়াতে মেক্সিকোবাসী বদ্ধপরিকর। যে দায়িত্ব মেক্সিকোর মানুষের ওপর তুলে দেওয়া হয়েছে, সে দায়িত্ব থেকে মেক্সিকো-বাসী নিজেদের পিছিয়ে নিয়ে যেতে রাজী নয়। এই আসরকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে যে কোনো মূল্য দিতে আমরা রাজী।' শেষ পর্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই শুরু হলো বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্ব।

মেক্সিকোর এবারের মূল পর্বে উপস্থিত হলো বিশ্বের চব্বিশটি দেশ। এই চব্বিশটি দেশকে ভাগ করা হলো ছটি গ্রুপে এবং প্রতি গ্রুপে রাখা হলো চারটি করে দল। ঠিক হলো গ্রুপের দলগুলির মধ্যে লীগ ভিত্তিতে খেলা চলবে। লীগ শেষে প্রতি বিভাগ থেকে পরবর্তী পর্যায়ে তোলা হবে প্রথম ছুটি দলকে, সেই সঙ্গে প্রতি বিভাগের বা গ্রুপের তৃতীয় স্থান অধিকারী দলগুলি থেকে বেছে নেওয়া হবে ফলাফল বিচার করে আরও চারটি দলকে। ফলে পরবর্তী পর্যায়ের খেলাগুলি হবে ষোলোটি দলের মধ্যে—এই খেলা হবে নক আউট ভিত্তিতে। এই ষোলোটি দল থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে আসবে আটটি দল। পরে—চারটি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে সেমি-ফাইনাল খেলা।

এবার আসি গ্রুপ বিন্যাসের কথায়। আগেই বলেছি ছিয়াশির আসরে উপস্থিত ছিল মোট চব্বিশটি দেশ। এই দেশগুলির মধ্যে কে কোন বিভাগে বা গ্রুপে পড়বে তা ঠিক করা হবে লটারীর মাধ্যমে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় মেক্সিকো সিটিতে এই লটারীর ব্যবস্থা করা হয়। লটারী করে মেক্সিকো সিটির পাঁচ বছরের একটি ছেলে—লুইস জেভিয়ার বারোজা। এই কিশোর লটারী করে চব্বিশটি দলকে ছটি গ্রুপ বা বিভাগে ভাগ করে। বলা বাহুল্য ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপে এই লুইসের মা সোনিকা মারিয়া লটারীর মাধ্যমে গ্রুপ বিন্যাস করেছিলেন।

এবারের আসরটি ছড়িয়ে দেওয়া হয় মেক্সিকোর নয়টি প্রধান শহরে। এই নয়টি শহরের বারোটি ষ্টেডিয়ামে ৫২টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে প্রধান স্থান হলো মেক্সিকো সিটি।

ছিয়াশির আসরে অংশ গ্রহণকারী চব্বিশটি দেশের মধ্যে কোন দেশ কোন বিভাগে ছিল এবার সেই কথাটি বলি।

ক বিভাগে—ইতালি আর্জেন্টিনা, বালগেরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া।

খ বিভাগে—মেক্সিকো, বেলজিয়াম, প্যারাগুয়ে, ইরাক।

গ বিভাগে—ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, রাশিয়া, কানাডা।

ঘ বিভাগে—ব্রাজিল, স্পেন, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, আলজিরিয়া।

ঙ বিভাগে—পশ্চিম জার্মানী, উরুগুয়ে, ডেনমার্ক, স্কটল্যাণ্ড।

চ বিভাগে—পোল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, পর্তুগাল, মরক্কো।

এবারের এই দলগুলির মধ্যে বিশ্বকাপ আসরে প্রথম অংশ নিতে দেখা গেল ডেনমার্ক, আফ্রিকার মরক্কো ও আলজিরিয়া, এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া ও ইরাক দলকে। ছিয়াশির আসরে চ্যাম্পিয়ান কে হবে তাই নিয়ে শুরু হলো পণ্ডিত মহলের বিস্তর আলোচনা। তবে এই ব্যাপারে প্রথমটায় কোনো পণ্ডিতই মুখ খুলতে রাজি হলেন না। তবু কেউ কেউ বললেন—'এবারের বিশ্বকাপ হয়তো ইউরোপের কোনো দেশ লাতিন আমেরিকা থেকে জয় করে নিয়ে যেতে পারে। কারণ ইউরোপের দলগুলির মধ্যে ফ্রান্স যথেষ্ট শক্তিশালী। তাদের দলে আছেন বিশ্বফুটবলের শ্রেষ্ঠ চারজন মিড ফিল্ডার।' অনেকে আবার আঙ্গুল দেখালেন সংগঠিত ডেনমার্ক দলটির দিকে। তাঁরা বললেন—'চলতি বছরে ডেনমার্ক যেভাবে প্রতিটি খেলা খেলে বিশ্বকাপের মূল পর্বে পৌঁছেছে, তাতে তাদের সম্ভাবনাকে একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এদের দলে আছেন বিখ্যাত লিভারপুল দলের সাত-সাতজন সুপার-ষ্টার। লাউড্রপ, ওলসন, সিমেনসন এঁরা কেউ কারো চেয়ে প্রতিভায় খাটো নন। এঁদের সম্মিলিত আক্রমণাত্মক খেলার ধরন আধুনিক ফুটবল দুনিয়াকে চমক দেবে।' আবার কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ রায় দিলেন ব্রাজিলের পক্ষে। তাঁরা বললেন—'ছিয়াশির আসরে ব্রাজিল তাদের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করবে। তাদের দলে আছেন অভিজ্ঞ জিকো, ফালকাও, সক্রেটিশ, জুনিয়ার সহ কারেকা, জেসিমার ও মুলারের মতো তরুণ ফুটবলারেরা। তাছাড়া মেক্সিকোর উষ্ণ পাহাড়ী আবহাওয়ায় ও উচ্চতায় ইউরোপীয় দলগুলিকে লড়াই করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।' আবার কোনো কোনো সমালোচক বললেন—'ব্রাজিল হয়তো বয়স্ক ফুটবলার দল নিয়ে ভুল করেছে। এই আসরে অভিজ্ঞতাই সব নয়—প্রয়োজন তারুণ্যের।'

এই দিক দিয়ে ব্রাজিলের কোচ তেলে সান্তানার চাইতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন আর্জেন্টিনার কোচ কার্লোস বির্লাডো। তিনি দলকে গড়েছেন তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে—যে দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বর্তমান বিশ্বের মূল্যবান্ ফুটবলার দিয়াগো মারাদোনা। গত বিশ্বকাপে তাঁর ওপর গোটা দলটা বড্ড বেশী নির্ভর করেছিল। ফলে তাঁকে বেশীর ভাগ সময় নীচে নেমে এসে খেলতে হয়েছিল। এবার সে তুলনায় মারাদোনা অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে খেলার সুযোগ পাবেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য দলে আছেন বর্গা, অসকার, গুরুচাগা, পেড্রো, ভালদোনা এবং অভিজ্ঞ পাসারেলা। কাজেই বির্লাডোর যন্ত্র-গুলির মধ্যে প্রত্যেকটি যদি সচল থাকে, তাহলে এই দলটিকে সহজে হারানো কোনো দলের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে লাতিন আমেরিকার দলগুলির মধ্যে ছিয়াশির আসরে সম্ভাব্য দল হিসাবে সেরা হলো উরুগুয়ে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোচ ওমর ব্যারোস একটি শক্তিশালী দলকে গড়ে তুলেছেন, যে দলটি পারে উরুগুয়েবাসীকে তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ এনে দিতে।

অবশেষে সমস্ত আলোচনার আবর্জনা সরিয়ে ৩১শে মে তারিখে শুরু হলো ছিয়াশির বিশ্বকাপ আসরের শুভ উদ্বোধন।

মেক্সিকো সিটির আজটেক ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো শুভ উদ্বোধন পর্ব। উদ্বোধন করলেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল ডিলা মাদ্রিদ। মার্চ পাষ্ট দিয়ে শুরু হলো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ফুলে, রঙিন ব্যানারে, ফেস্টুনে, বেলুনে গোটা শহর হয়ে উঠেছিল বর্ণময়। দেখে বোঝার কোনো উপায় ছিল না, মাত্র কয়েক মাস আগে ভয়াবহ ভূমিকম্প এই শহরটিকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। এখনও খোঁজ করলে বর্ণময় আসরের আনাচে-কানাচে খুঁজে পাওয়া যাবে কদর্য গলিত শব। শহরের বুকে কান পাতলে শোনা যাবে গৃহহীন মানুষের কান্না—একখণ্ড রুটির জন্য ক্ষুধার্ত শিশুর করুণ আর্তনাদ।

তবু আসর শুরু হলো। ফুটবলের উন্মাদনা ভুলিয়ে দিলো ভয়াবহ ভূমিকম্পের আতঙ্কিত স্মৃতিকে। সব ভুলে এই দিন মাঠে হাজির হলো ১ লক্ষ ১৪ হাজার মানুষ। উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন মেক্সিকোর ফুটবল সংস্থার প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট সহ ফিফা সংস্থার সভাপতি হ্যাভেলাঞ্জ।

নৃত্য-গীতের আনন্দ অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র বেজে উঠলো উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হওয়ার বাঁশী। উদ্বোধনী এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হলো গতবারের চ্যাম্পিয়ান ইতালীর সঙ্গে বালগেরিয়া দলের। এই ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ান ইতালী চ্যাম্পিয়ান দলের মতো খেলতে পারলো না। প্রথমার্ধে তারা প্রাধান্য রেখে খেললেও গোল করার বহু সুযোগ তারা অপচয় করলো। বোঝা গেল, রোসিকে না নামিয়ে ইতালী মস্ত ভুল করেছে। ভাগ্য ভালো থাকায় প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে একটি হাফ-চান্স থেকে গোল করলেন আলতোবেলী। বলা বাহুল্য এই আলতোবেলী গত বছর বিশ্বকাপের ফাইনালে ইতালীর হয়ে শেষ গোলটি করেছিলেন—এবার তাঁরই পা থেকে এলো ছিয়াশির বিশ্বকাপে প্রথম গোল—ফলে তিনি হলেন একটি চমৎকার রেকর্ডের অধিকারী। আলতোবেলীর এই গোলটি পাওয়ার পরই ইতালী দল যেন গুটিয়ে গেল। তারা গোলের ব্যবধান বাড়াবার দিকে নজর না দিয়ে ম্যাচ বাঁচাতে হয়ে উঠলো বদ্ধপরিকর। ফলে তাদের রক্ষণাত্মক খেলার সুযোগে শেষ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়া বালগেরিয়া দল খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনলো। বাঁ দিক থেকে মার্কভের সেন্টারে মাথা ছুঁয়ে চমৎকার গোল করলেন সিয়াকভ। ফলে চ্যাম্পিয়ান ইতালী দলের পক্ষে মাথা উঁচু করে মাঠ থেকে বেরুনো সম্ভব হলো না। প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ করে নেওয়ার ফলে ইতালীকে পরের দুটি খেলায় যথেষ্ট লড়াই করতে হলো। এই বিভাগে সেরা খেলার পরিচয় দিলো আর্জেন্টিনা। আজটেকে তারা সহজ জয় পেলো এশিয়ার ফুটবল দেশ দক্ষিণ কোরিয়া দলের সঙ্গে। এই ম্যাচে দুরন্ত ফুটবলের পরিচয় দিলেন মারাদোনা। তাঁকে আটকে রাখার সাধ্য কোরিয়ানদের ছিল না। তারা নিরুপায়ভাবে এই ম্যাচে দল বেঁধে নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছিল মারাদোনার ওপর। শেষ পর্যন্ত মারাদোনার ঝড়ো গতির সামনে কোরিয়ানদের প্রতিরোধের দুর্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ৩—১ গোলে ম্যাচ জিতে যায় আর্জেন্টিনা। গোল করলেন ভালদোনা দুটি এবং রাগেরি একটি। খেলা শেষ হওয়ার ১৭ মিনিট আগে কোরিয়ানদের হয়ে একমাত্র গোলটি করলেন পার্ক চুং সু।

প্রথম ম্যাচে কোরিয়ানদের চরিত্র বোঝা না গেলেও, তাদের স্বকীয়

মেজাজ ধরা পড়লো পরের দুটি ম্যাচে। বালগেরিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় খেলায় তারা ছিনিয়ে নিলো একটি মূল্যবান্ পয়েন্ট। ম্যাচ শেষ হলো ১—১ গোলে। এই বিভাগের অন্য আর একটি খেলায় ইতালীকে আবার একটি পয়েন্ট হারাতে হলো আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে মারাদোনা একাই লড়াই করলেন আর্জেন্টিনার হয়ে। তাঁকে আটকে রাখতে হিমসিম খেলেন কন্টি, ক্যাব্রিনির মতো ফুটবলারেরা। এই ম্যাচেও রোসিকে নামানো হলো না। অসংখ্য সুযোগ নষ্ট করা ইতালী এই ম্যাচে প্রথম পেনাল্টিতে গোল পেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। গোল দিলেন গত ম্যাচের নায়ক আলতোবেলী। ৪৪ মিনিটের মাথায় খেলার সমতা আনলেন মারাদোনা। শেষ ম্যাচে আর্জেন্টিনা ২—০ গোলে বালগেরিয়াকে হারানোর সুবাদে পেয়ে গেল শীর্ষস্থান।

অন্যদিকে শেষ ম্যাচে প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে কোনো-রকমে জয় পেয়ে মুখ রক্ষা হলো ইতালীর। এই ম্যাচে খুঁদে কোরিয়ানরা অভাবনীয় ফুটবলের পরিচয় দিলো। তারা বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দিলো, এশিয়ার ফুটবল ইউরোপের তুলনায় খুব একটা পিছিয়ে নেই। ৩—২ গোলে ম্যাচ হারলেও বিশ্বজনের প্রশংসা আদায় করে নিলো দক্ষিণ কোরিয়া দলটি। মনে করিয়ে দিলো বিশ্ববাসীকে নতুন করে ১৯৬৬ সালের কথা। এই ম্যাচের বিবরণ লিখতে বসে ফুটবল সম্রাট পেলে বললেন—'এশিয়ার এই দলটির কথা বিশ্ববাসী বহুদিন মনে রাখবে। আগামী দিনে এশিয়ার যে কোনো দেশকে বড়ো আসরে প্রবেশ করার আগে কোরিয়ানদের কবর মাড়িয়ে আসতে হবে।' গ্রুপ লীগের তিনটি খেলায় এশিয়ার এই দলটি দিলো চারটি গোল। শেষ ম্যাচে জয়ের সুবাদে ইতালী পেলো ক বিভাগে দ্বিতীয় স্থান।

খ বিভাগের খেলায় শীর্ষস্থান পেলো মেক্সিকো। প্রথম ম্যাচে তারা বেলজিয়ামকে হারালো ২—১ গোলে। এই ম্যাচে মেক্সিকোর হয়ে গোল দুটি করলেন ফার্ণাণ্ডো কুইরাবত ও হুগো সানচেজ। এই সানচেজ ছিলেন এবার মেক্সিকো দলের প্রধান ভরসা। কিন্তু বেচারা সুনাম অনুযায়ী নিজেকে মেলে ধরতে পারেন নি। এই বিভাগে উত্তেজনাময় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় লাতিন-আমেরিকার সেরা দুই দল মেক্সিকো বনাম প্যারাগুয়ের মধ্যে।

১৯৫৮ সালের পর প্যারাগুয়ে দলটিকে বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলতে দেখা গেল। এইদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন এক লক্ষ সাড়ে চোদ্দো হাজার দর্শক। এটি একটি রেকর্ড। এই ম্যাচে কোনো দলই হারতে রাজি না থাকায় ম্যাচ হলো মূলতঃ রক্ষণাত্মক। দুই দলের খেলোয়াড়েরা বল ছেড়ে পরস্পরের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করলেন। হলুদ কার্ড দেখলেন সানচেজ। নিম্ন মানের এই ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ১—১ গোলে শেষ হলো। শেষ ম্যাচে মেক্সিকো দল ১—০ গোলে হারালো ইরাক দলকে। প্রথম ম্যাচে ইরাক দলকে হারতে হয়েছিল প্যারাগুয়ের কাছে। গ্রুপ লীগের শেষ খেলায় বেলজিয়াম বনাম প্যারাগুয়ের ম্যাচটি ২—২ গোলে শেষ হলো। ফলে খ বিভাগের খেলায় মেক্সিকো ৩টি ম্যাচে ৫টি পয়েন্ট পেয়ে পেলো শীর্ষস্থান। দ্বিতীয় স্থান পেলো ৪ পয়েন্ট পেয়ে প্যারাগুয়ে দল।

গ বিভাগের প্রথম ম্যাচে বিস্ময় সৃষ্টি করলো সোভিয়েত দল। তারা প্রথম ম্যাচে দুর্ধর্ষ হাঙ্গেরী দলকে ৬—০ গোলে বিধ্বস্ত করলো। হাঙ্গেরীর এই পরাজয়ে চমকে গেল সকলে। রাশিয়ানদের দলবদ্ধ ক্রীড়াবিন্যাস উৎসাহী করে তুললো সমর্থকদের। শুরু হলো রাশিয়ানদের নিয়ে গুঞ্জন। এই বিভাগের আর একটি শক্তিশালী দল হলো ফ্রান্স। এই দলটিকে নিয়ে এবার বিশেষজ্ঞদের অনেক আশা। ফ্রান্স বর্তমানে ইউরোপের চ্যাম্পিয়ান দল। এই দলে আছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তারকা প্লাতিনি। প্রথম ম্যাচে ফ্রান্স অবশ্য খুব একটা সুবিধে করতে পারে নি। কানাডার বিরুদ্ধে একটিমাত্র গোল দিয়েই তারা নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল। পরের ম্যাচে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তারা নতুন মেজাজে খেলতে নামলো। এই ম্যাচে শুরুতেই গোলের সুবর্ণ সুযোগ অপচয় করলেন সোভিয়েতের জাভারভ। তবু তারা একতরফা খেলতে কসুর করলো না। গোল এলো ২০ মিনিটের মাথায়। দেমিয়াঙ্কো প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে দিলেন সোভিয়েত দলকে। গোল খেয়ে তেতে উঠলো ফ্রান্স। দ্বিতীয়ার্ধে তারা খেললো একচেটিয়া প্রাধান্য নিয়ে। এই সময় বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ নষ্ট করলো ফ্রান্সের খেলোয়াড়েরা। প্লাতিনিকে সারা খেলায় একটিমাত্র দর্শনীয় থ্রু পাশ দেওয়া ছাড়া আর বড়ো একটা নড়াচড়া করতে দেখা গেল না। খেলায় সমতা আনলেন ফার্নাণ্ডেজ।

শেষ মুহূর্তে প্লাতিনির থ্রু ধরতে না পারায় নিশ্চিত একটি গোলের সুযোগ নষ্ট করলেন পাপিন। ম্যাচ শেষ হলো ১—১ গোলে। অন্যদিকে হাঙ্গেরী প্রথম ম্যাচের বিষন্নতা কাটিয়ে জয় তুলে নিলো কানাডার বিরুদ্ধে ২—১ গোলে। শেষ ম্যাচে ফ্রান্স হাঙ্গেরীকে ৪—০ গোলে হারিয়ে দিলো। এই ম্যাচে প্লাতিনি গোল না পেলেও মাঠের মধ্যে সেরা খেলাটি মেলে ধরেছিলেন। কানাডার বিরুদ্ধে সোভিয়েত শেষ ম্যাচে দলের নজন খেলোয়াড়কে বদল করে ম্যাচ জিতলো ২—০ গোলে। ফলে গ বিভাগে ফ্রান্স ও সোভিয়েত দল তিনটি করে ম্যাচ খেলে সংগ্রহ করলো পাঁচ পয়েন্ট। তবে গোল এ্যাভারেজে সোভিয়েত পেলো এই বিভাগে শীর্ষস্থান। দ্বিতীয় স্থান পেলো ফ্রান্স।

ঘ বিভাগে ব্রাজিল সরাসরি জয় পেলো তিনটি ম্যাচে। তাদের খেলা দেখে মনে হলো তারা যেন গতবারের তুলনায় অনেক বেশী সংগঠিত হয়েই মাঠে নেমেছে। চমৎকার ফুটবলের পরিচয় দিলেন নবাগত কারেকা ও জেসিমার। ওয়াদালাজারায় প্রথম ম্যাচে ব্রাজিল ১—০ গোলে ম্যাচ জিতলো স্পেনের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে জিকো, ফালকাও, অসকারকে মাঠে নামতে দেখা গেল না। ৬৩ মিনিটের মাথায় চমৎকার গোল করে সক্রেটিশ দলের জয় এনে দিলেন। এরপর ব্রাজিল আবার ১—০ গোলে জয় পেলো আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে গোল করলেন কারেকা। শেষ ম্যাচে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে ৩—০ গোলে হারালো ব্রাজিল। ফলে তিনটি ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়ে তারা পেলো শীর্ষস্থান। দ্বিতীয় স্থান পেলো স্পেন। তারা প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলের কাছে পরাজিত হলেও জয় পেয়ে গেল আয়ারল্যাণ্ড ও আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে।

ঙ বিভাগে চমক আনলো নবাগত ডেনমার্ক। এবারের আসরে বিশেষজ্ঞের দল ডেনমার্ক দলটিকে প্রথম থেকেই ডার্ক-হর্স হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। কারণ একাধিক তরুণ প্রতিভা নিয়ে গড়া ডেনমার্কের খেলার ধরন ছিল বৈচিত্র্যময়। গতি ও স্কিলের এমন সমন্বয় অন্য কোনো দলের মধ্যে দেখা যায় নি। তাছাড়া এই দলটিতে ছিলেন আধুনিক দুনিয়ার সেরা নক্ষত্ররা। এতোগুলি সুপার-ষ্টারকে একত্রে মেলে ধরতে অন্য কোনো দলকে

এবারের আসরে দেখা যায় নি। স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রথম ম্যাচে পুরোপুরি পেশাদার মনোভাব নিয়ে খেলে অতি সহজে ১—০ গোলে ম্যাচ জিতে গেল ডেনমার্ক। গোল করলেন ৫৮ মিনিটের মাথায় এলকাজায়ের। বিপরীত দিকে স্কট দল যে কোনো সুযোগ তৈরী করতে পারে নি তা নয়। তারা খেলায় সমতা আনার একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করলো। গোলরক্ষককে একা পেয়েও ৬ গজ দূর থেকে বলটিকে গোলে ঠেলতে পারলেন না চার্লি লিকোলাস। এই বিভাগে প্রচণ্ড লড়াই হলো মূলতঃ তিনটি দলের মধ্যে। ডেনমার্ক ছাড়া এই বিভাগে ছিল পশ্চিম জার্মানী ও উরুগুয়ে। এদের মধ্যে প্রথম ম্যাচে উরুগুয়ে ও পশ্চিম জার্মানীর খেলাটি শেষ হলো ১—১ গোলে। উরুগুয়ের এই গোলটিতে জার্মান দলের যথেষ্ট আপত্তি ছিল। কিন্তু রেফারি কোনোরকম কর্ণপাত করলেন না। প্রথম ম্যাচে একটি পয়েন্ট হারানো জার্মান দল দ্বিতীয় ম্যাচে ২—১ গোলে স্কট দলকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ওঠার রাস্তা কিছুটা পরিষ্কার করে নিলো। এই ম্যাচে জার্মান খেলোয়াড়েরা ঝড়ের বেগে ফুটবল খেললো। বুঝিয়ে দিলো এবারের আসরে তারাও একজন দাবিদার। অন্যদিকে দলবদ্ধ ফুটবলের পরিচয় দিয়ে উরুগুয়ে দলটিকে শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত করলো ডেনমার্ক। তারা উরুগুয়ে দলটিকে নিয়ে মাঠের মধ্যে যেন ছেলেখেলা করলো। ম্যাচ জিতলো দুরন্ত ডেনমার্ক দল ৬—১ গোলে। এই ম্যাচে এবারের বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন বর্তমান ফুটবল জগতের অন্যতম নায়ক ডেনমার্কের এলকাজায়ের। পর পর দুটি ম্যাচে জেতায় ডেনমার্ক পরবর্তী রাউণ্ডে প্রবেশ করার ব্যাপারে একরকম প্রায় নিশ্চিন্ত থাকলো। শেষ ম্যাচে উরুগুয়ে ও স্কটল্যাণ্ডের খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হলেও, ডেনমার্কের কাছে ২—০ গোলে হার স্বীকার করতে বাধ্য হলো পশ্চিম জার্মানী। ফলে তিনটি ম্যাচের একটিতে জয় পাওয়ার সুবাদে পশ্চিম জার্মানী ডেনমার্কের কাছে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও পেলো দ্বিতীয় স্থান। এই বিভাগে উরুগুয়ে দলটি এবারের আসরে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিলো। অথচ এই দলটির প্রতি বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল অন্যরকম। সকলেই আশা করেছিলেন মেক্সিকোর আসরে এবার লাতিন-আমেরিকান গোষ্ঠির মধ্যে তারাই জোরদার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে

দেবে—তা কিন্তু হলো না। বরং তাদের নিম্নমানের ফুটবল হতাশার সৃষ্টি করলো। ফিফা কর্তৃক সতর্কিত হলো গোটা উরুগুয়ে দলটি। ফলে বিতর্কিত পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে উরুগুয়ে দলটিকে অতি দ্রুত প্রতিযোগিতায় বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হলো।

চ বিভাগে ফুটবলে নয়া বিপ্লব ঘোষণা করলো নবাগত মরক্কো দল। আফ্রিকার এই দলটি প্রতি ম্যাচেই রাখলো অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয়। বোঝা গেল, এই দলটিকে সহজে হারানো প্রতিপক্ষ অভিজ্ঞ দল-গুলির চট্ করে সম্ভব হবে না। মণ্টেরে প্রথম ম্যাচেই গতবারের তৃতীয় স্থান অধিকারী পোল্যাণ্ড দলকে রুখে দিলো মরক্কো। ঝড়ের গতিতে চিত্তাকর্ষক ফুটবল খেলে প্রথম ম্যাচেই তারা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিলো। স্মোলারেক, বেনিয়েকের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরা হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও গোল করতে পারলেন না। ম্যাচটি গোলশূন্যভাবে শেষ হলো। দ্বিতীয় ম্যাচে মরক্কো দলকে মুখোমুখি হতে হলো ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে। এই ম্যাচে ভাগ্য প্রসন্ন থাকায় কোনোরকমে ম্যাচ বাঁচালো ইংল্যাণ্ড। খেলা শেষ হলো গোলশূন্য ফলাফলে। শেষ ম্যাচে পোর্তুগাল দলকে ২—০ গোলে হারিয়ে মরোক্কো পেয়ে গেল বিভাগীয় লীগে শীর্ষস্থান। পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ইংল্যাণ্ড জয় পেলো ৩—০ গোলে। এই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করলেন লিনেকার। ইংল্যাণ্ডের এই জয় তাদের এনে দিলো দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার অধিকার। এই বিভাগে তৃতীয় স্থান পেলো পোল্যাণ্ড দল।

প্রাথমিক ম্যাচগুলি শেষ হলো। মোট চব্বিশটি দলের ছটি বিভাগের ৩৬টি খেলায় এই পর্বে গোল হলো ৮৪টি। লীগ পর্যায়ের খেলায় সর্বোচ্চ গোল দিলো ডেনমার্ক ও সোভিয়েত দল। তারা তিনটি ম্যাচে পেলো নটি গোল। একটি 'ম্যাচে সর্বোচ্চ গোল এলো ডেনমার্ক বনাম উরুগুয়ের খেলায় —সাতটি। ফলাফল ছিল এই ম্যাচে ৬—১। একটি হ্যাটট্রিক সহ পাঁচটি গোল দিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার শীর্ষে থাকলেন ইংল্যাণ্ডের লিনেকার ও ডেনমার্কের এলকাজায়ের। উত্তেজনা বাড়লো পরবর্তী প্রি-কোয়ার্টার রাউণ্ডের খেলায়। এই পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে দেখা গেল ষোলোটি দলকে। ছটি বিভাগের প্রথম দুটি দলসহ তৃতীয় স্থান থেকে চারটি দলকে বেছে নেওয়া হলো।

প্রি-কোয়ার্টার রাউণ্ড

১৫ই জুন আজটেক ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো প্রি-কোয়ার্টার রাউণ্ডের প্রথম ম্যাচ। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হলো মেক্সিকো বনাম বালগেরিয়া দলের মধ্যে। এই ম্যাচে দেশবাসীর বিপুল সমর্থনকে পাশে পেয়ে অতি সহজে ম্যাচ জিতে গেল মেক্সিকো দল। তারা ম্যাচ জিতলো ২—০ গোলে।

এই দিনই দ্বিতীয় ম্যাচে চলতি আসরে অঘটন ঘটালো বেলজিয়াম দল। তারা অপ্রত্যাশিত ভাবে ম্যাচ জিতে গেল ৪—৩ গোলে। সোভিয়েতের এই পরাজয় বিশ্বের মানুষকে থমকে দিলো। দু গোলে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য গোলের সুযোগ অপচয় করার ফলশ্রুতি হিসাবে এই পরাজয়কে মেনে নিতে বাধ্য হলো। যদিও তাদের বিরুদ্ধে বেলজিয়াম দলের দুটি গোলই ছিল অবৈধ। বিশ্বমানের খেলায় এত ত্রুটিপূর্ণ রেফারিং আর কোনো আসরে ধরা পড়ে নি। নির্দিষ্ট সময় খেলা ২—২ গোলে শেষ হওয়ায় ম্যাচ গড়ালো অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে। এই সময়ে বেলজিয়াম খেলোয়াড়েরা অভাবনীয় ফুটবলের পরিচয় দিলো। সোভিয়েত দলের হয়ে এই ম্যাচে বেলানভ তৃতীয় গোলটি করে হ্যাটট্রিক করা সত্ত্বেও তাঁর দলকে পরাজিত হতে হলো। ক্লাসেনের দেওয়া চতুর্থ গোলে জয় পেয়ে গেল বেলজিয়াম।

পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জয় পেতে কোনোরকম বেগ পেতে হলো না ব্রাজিল দলকে। অসামান্য টাচ ফুটবলের পরিচয় দিলেন জিকো। শেষ কুড়ি মিনিট মাঠে নেমে তিনি যেন নিখুঁত একটি ছবি আঁকলেন। ব্রাজিলের হয়ে প্রথম গোলটি এলো পেনাল্টি থেকে। গোল দিলেন সক্রেটিশ। দ্বিতীয় গোলটি অভাবনীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে অকল্পনীয় ভাবে দুরূহ কোণ থেকে একটি স্বপ্নের মতো গোল করলেন নবাগত কৃষ্ণাঙ্গ জেসিমার। তৃতীয় ও চতুর্থ গোল এলো জিকোর টার্চ ফুটবলের স্পর্শে। তাঁর পাশ থেকে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে গোল দুটি করলেন এডিনহো ও কারেকা। ব্রাজিলের এই জয় তাদের সমর্থকদের মনে জাগিয়ে তুললো আশার আলো। বোঝা গেল তেলে সান্তানা এবার বিশ্বকাপ জয়ের প্রত্যাশা নিয়েই মেক্সিকোয় এসেছেন।

তৃতীয় স্থান অধিকারী দল হিসাবে গ্রেস মার্কে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে

উঠে আসা উরুগুয়ে দলটি নিজেদের মেলে ধরতে পারলো না। মাথার ওপর অর্থদণ্ডের আদেশ ঝোলানো অবস্থায় মাঠে খেলতে নেমে তারা নিজেদের গুটিয়ে রাখলো সারাক্ষণ। এই ম্যাচে মারাদোনাকে দাবিয়ে রাখা উরুগুয়ের রক্ষণভাগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর অনবদ্য থ্রু পাশ থেকে গোল করে পাশকলি আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দিলো।

সকলের ধারণা ছিল এই পর্যায়ের সেরা ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ফ্রান্স বনাম ইতালির মধ্যে। ইতালি গতবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান, কাজেই তারা সম্মান রক্ষার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখবে না। অন্যদিকে ফ্রান্স বর্তমান ইউরোপের চ্যাম্পিয়ান দল। তাদের দলে আছে বিশ্বের সেরা চারজন মিড-ফিল্ডার। কাজেই লড়াই নিশ্চয় জমবে ইউরোপের এই দুটি শ্রেষ্ঠ দলের মধ্যে। কার্যত কিন্তু তা হলো না। এই ম্যাচে ফ্রান্স একতরফা ফুটবল খেললো। প্রথম থেকেই নিজেদের গুটিয়ে রেখেছিল ইতালি। এই ম্যাচেও ইতালির জয়ে রোসিকে মাঠে দেখা গেল না। গোল করার ব্যাপারে একমাত্র ভরসা ছিলেন আলতোবেলী। কিন্তু দলীয় খেলোয়াড়দের কোনো-রকম সাহায্য না পাওয়ায় আলতোবেলীর পক্ষে এইদিন গোল করা সম্ভব হলো না। অপর দিকে নিজেকে স্বকীয় মেজাজে এই ম্যাচে মেলে ধরেছিলেন প্লাতিনি ও তিগানা। এই ম্যাচে প্লাতিনিকে 'হাইণ্ড-স্ট্রাইকার' হিসাবে ব্যবহার করলো ফ্রান্স। প্রথম গোল করলেন স্বয়ং প্লাতিনি। দ্বিতীয় গোল এলো প্লাতিনির অনবদ্য থ্রু পাশ থেকে। গোলটি দিলেন স্টোপিরা।

মেক্সিকো সিটিতে ইংল্যাণ্ড অতি সহজে বিধ্বস্ত করলো প্যারাগুয়ে দলকে। এই ম্যাচে ইংল্যাণ্ড জয় পেলো ৩—০ গোলে। অনবদ্য দুটি গোল করলেন লিনেকার।

মরোক্কোর বিরুদ্ধে জেতার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই করতে হলো পশ্চিম জার্মানী দলকে। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ মরোক্কো ফুটবলারেরা বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমি জার্মানদের দখল করতে দিলো না। প্রচণ্ড গতির মধ্যে ম্যাচটি হয়ে উঠেছিল উপভোগ্য। অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় মরোক্কো দল সুযোগ তৈরী করেও তা সদ্ব্যবহার করতে পারলো না। শেষ মুহূর্তে ভাগ্যনির্ভর জার্মান দল একটি ফ্রি-কিক থেকে গোল পেয়ে গেল। চমৎকার

এই ফ্রি-কিকটি করেছিলেন লুথার ম্যাথিয়ুজ। তাঁর শটটি প্রচণ্ড গতিতে বাঁক খেয়ে গোলের মধ্যে প্রবেশ করেছিল।

কুয়েরেটোরোয় আবার একটি অঘটন ঘটালো স্পেন। তারা দক্ষ শিকারীর মতো বুদ্ধি দিয়ে ফুটবল খেলে আবেগনির্ভর ডেনমার্ক দলটিকে বোতলবন্দী করে ফেললো। শুরুতে ডেনমার্ক 'কনট্রা-সিস্টেম' ট্যাক্টিক্সে ফুটবল খেলে স্পেনকে সাময়িকভাবে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। এই সময় একতরফা আক্রমণের মধ্যে দিনের সহজতম একাধিক সুযোগ হাতছাড়া করেন লাউড্রপ, ওলসন, এলকাজায়ের। এই সুযোগগুলি থেকে কম করে তিন গোলে ডেনমার্ক দলটির এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। নামী খেলোয়াড়দের একের পর এক এই ধরনের ব্যর্থতা গোটা দলটিকে ক্রমশঃ দিশেহারা করে তুললো। সুযোগের অপেক্ষায় থাকা স্পেনীয় খেলোয়াড়েরা এই সময় খেলার মধ্যে প্রয়োগ করে বাড়তি গতি। এতো গতিতে এবারের বিশ্বকাপে আর কোনো দলকে খেলতে দেখা যায় নি। এই সময় চমৎকার ফুটবলের পরিচয় দিলেন স্পেনের গোল্ডেনবয় বুত্রাগুয়েনো। স্পেনের পাঁচটি গোলের মধ্যে চারটি গোলই এলো তাঁর পা থেকে। ১৯৬৬ সালে পর্তুগালের ইউসোবিওর পর বুত্রাগুয়েনো হলেন অষ্টম ফুটবলার যিনি বিশ্বকাপ আসরে একটি ম্যাচে চারটি গোল করার নজির গড়লেন। ফলে সম্ভাব্য তালিকা থেকে এই পর্যায়ের খেলা শেষে সরে যেতে বাধ্য হলো সোভিয়েত ও ডেনমার্কের মতো সাড়া জাগানো দুটি দলকে। শুরু হলো আটটি দল নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল রাউণ্ডের খেলা।

জোয়েল বাট্‌সের কাঁধে চাপলো ফ্রান্স :

ফুটবলও যে সময় সময় নাটক হতে পারে, ক্লাইমেক্স-এ্যান্টি-ক্লাইমেক্সের সংঘাতে জমজমাট হয়ে উঠতে পারে একটি ম্যাচ, তারই একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছিল গুয়াদালাজারায় ফ্রান্স বনাম ব্রাজিলের খেলাটির মধ্যে। এই ম্যাচে কে জয় পাবে সেকথা আগেভাগে বলা ছিল খুব মুস্কিল। একদিকে লক্ষণীয় ছিলেন প্লাতিনি, অন্যদিকে আকর্ষণীয় ছিলেন জিকো, সক্রেটিশ, জেসিমার, কারেকার মতো ফুটবলারেরা। ম্যাচটি শুরু হতেই ফ্রান্স প্রচণ্ড

গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ব্রাজিলের সীমানার মধ্যে। এই ম্যাচে আক্রমণের নেতৃত্ব দিলেন প্লাতিনি। তাঁর পায়ের যাদুতে দেখা গেল বিদ্যুতের শিহরণ। দক্ষ শিল্পীর মতো প্লাতিনি এইদিন তাঁর পা দুটিকে যেন সূক্ষ্ম তুলিতে পরিণত করেছিলেন। সাময়িক আক্রমণের ধাক্কা সামলে নিতে ব্রাজিলিয়ানরা অবশ্য ভুল করলো না। তারা নিজেদের অতি ত্রস্ত গুছিয়ে নিয়ে ফিরে এলো আক্রমণে। প্রচণ্ড গতিতে বল ছুটে চললো এক গোল থেকে অন্য গোলে। হঠাৎ তারই মধ্যে চকিতে একটি গোল দিয়ে এগিয়ে গেল ব্রাজিল। সক্রেটিশ ডান দিক থেকে উঠে এসে বল বাড়ালেন জুনিয়ারকে। জুনিয়ার শরীরের মোচড়ে দু-জন ডিফেনডারকে পিছনে ফেলে রেখে বল ঠেলে দিলেন বাঁ দিক থেকে ছুটে আসা কারেকাকে। এই সহজ বলটিকে গোলে ঠেলে দিতে কোনোরকম ভুল করলেন না কারেকা। গোল খেয়ে ফ্রান্স নতুন উদ্যমে আবার খেলা শুরু করলো। এই সময় নিজেকে মাঝ মাঠে দেবতার চেহারায় মেলে ধরলেন তিগানা। তবু ব্রাজিলিয়ানদের আক্রমণের ঘাটতি ছিল না। ভাগ্য প্রসন্ন না থাকায় দুটি ক্ষেত্রে সহজ গোলের সুযোগ হাতছাড়া করলেন জেসিমার ও মুলার। অকল্পনীয়ভাবে মুলারের শট পোষ্টে প্রতিহত হল। বোঝা গেল এই ম্যাচ জয়ের জন্য ব্রাজিলিয়ানদের আরও পরিশ্রম করতে হবে। ভাগ্য তাদের সহায় নেই। সত্যি, ভাগ্য এই ম্যাচে ব্রাজিলিয়ানদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নি। তারই প্রমাণ হিসাবে বলা যায় প্লাতিনির গোলটি। এই গোলটি তো প্লাতিনির পাওয়া উচিত ছিল না। বলটি আশ্চর্যজনকভাবে নাগাল টপকে গিয়েছিল কার্লোস ও সিজারের। শুধু তাই নয়, বলটি কার্লোসের হাতে লাগায় গতিপথ পরিবর্তন হয়, ফলে বল এসে পড়ে অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে ফাঁকায় দাঁড়ানো প্লাতিনির পায়ে, সে বলটিকে গোলে ঠেলে দিতে কোনোরকম ভুল করলেন না প্লাতিনি। এরপরেই শুরু হয় ব্রাজিলিয়ানদের একতরফা আক্রমণ। জিকো বদলী হিসাবে মাঠে নেমেই একটি পেনাল্টি আদায় করলেন। এই সুযোগ থেকে ব্রাজিলের এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এইদিন তাদের পিছু তাড়া করেছিল, ফলে বিশ্বের মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখলেন জিকো নামক বিশ্বের

একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে পেনাল্টি শটের মতো একটি সহজতম সুযোগের অপচয় করতে। অনন্য ভূমিকায় এই ম্যাচে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফরাসী গোলরক্ষক বাট্‌স। এই ম্যাচে অন্তত দুটি ক্ষেত্রে নিশ্চিত গোল রক্ষা করে দলের খেলোয়াড়দের তিনি উৎসাহিত করলেন। নির্দিষ্ট সময় পার করে ম্যাচ গড়ালো অতিরিক্ত সময়ে। তাতেও কোনো ফলাফল তৈরী হলো না। ফলে নিতে হলো টাই-ব্রেকারের সাহায্য। ফুটবলে যে আজও অঘটন ঘটে তার প্রমাণ আরও স্পষ্ট হলো টাই-ব্রেকিং চলার সময়। যে সক্রেটিশ ঠাণ্ডা মাথায় পেনাল্টি শট করার একজন সেরা খেলোয়াড় সেই তিনি প্রথম শটটি অপচয় করলেন। চমৎকার দক্ষতায় সক্রেটিশের শট ঘুষি মেরে উড়িয়ে দিলেন বাট্‌স। এরপর ফ্রান্স এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও ব্রাজিলের কাছে আবার একটি সুযোগ এসে গেলো। ফ্রান্সের পক্ষে সুপার-ষ্টার প্লাতিনি পেনাল্টি শটে বেলুন ওড়ালেন। ফলে ম্যাচে আবার সমতা ফিরে এলো। শেষ মুহূর্তে সিজারের শট পোষ্টে প্রতিহত হওয়ায় ছিয়াশির বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলো ব্রাজিল। গত বছর সেমি-ফাইনালে যে টাই-ব্রেকারে হেরে ফ্রান্সকে সেমি-ফাইনাল থেকে সরে যেতে হয়েছিল, সেই টাই-ব্রেকারেই জিতে ফ্রান্স ছিয়াশির আসরে উঠে এলো সেমি-ফাইনালে।

শুধু এই একটি ম্যাচ নয় কোয়ার্টার ফাইনালের আরও দুটি ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হলো টাই-ব্রেকার পদ্ধতিতে। মণ্টেরে পশ্চিম জার্মানী টাইভাঙ্গা খেলায় ম্যাচ জিতলো মেক্সিকো দলের বিরুদ্ধে ৪—১ গোলে এবং বেলজিয়াম একমাত্র ভাগ্যকে সম্বল করে স্পেনকে ৫—৪ গোলে হারিয়ে উঠে এলো সেমি-ফাইনালে। এই পর্যায়ের সেরা ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হলো মারাদোনা বনাম ইংল্যাণ্ড দলের মধ্যে। এই ম্যাচে মারাদোনা বিশ্ববাসীকে আর একবার প্রমাণ করে দিলেন আধুনিক বিশ্বে তিনি হলেন অদ্বিতীয় ফুটবলার।

মারাদোনার স্বপ্নের গোল

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জয় পাওয়া যে খুব একটা সহজ হবে এই বিশ্বাস কারো ছিল না। তবু বিশ্বের মানুষ তাকিয়েছিল দশ নম্বর জার্সি দিয়াগো মারাদোনার দিকে। প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন মারাদোনা এইদিন

যেন যাদুখেলা দেখালেন। ছোট্ট একটা রুমালের মতো একখণ্ড জমির ওপর বল রেখে অসামান্য দক্ষতায় যে দু-তিনজন ডিফেন্ডারকে অতি-সহজে ছিটকে ফেলা যায় তার প্রমাণ দিলেন মারাদোনা। প্রথম দশ মিনিটে ইংল্যাণ্ড যে ভাবে আক্রমণে উঠে এসেছিল তাতে মনে হয়েছিল এই ম্যাচে আর্জেন্টিনার পক্ষে ম্যাচে ফেরা খুব কঠিন হয়ে উঠবে। আসলে ইংল্যাণ্ডকে এই সুযোগটি যেন তারা ইচ্ছাকৃতভাবে করে দিয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের ক্ষমতাকে যাচাই করে নেওয়া। এর পরেই মারাদোনা ধীরে ধীরে নিজেকে মেলে ধরলেন। মাঝ মাঠ দখল করে নিলো তাঁর নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা দল। গতির সঙ্গে শিল্পের এমন সমন্বয় ঘটাতে আধুনিক ফুটবলে তাঁর মতো কাউকে দেখা যায় নি। তাঁর পায়ের যাদুতে একদিকে যেমন ফুল ফুটলো অন্যদিকে প্রচণ্ড গতির প্রবাহে ধ্বসে গেল ইংল্যাণ্ডের প্রতিরোধ দুর্গ। প্রথমার্ধে সতীর্থদের দিয়ে গোল করানোর চেষ্টায় ব্যর্থ মারাদোনা দ্বিতীয়ার্ধে নিজেই নিলেন গোটা দলের দায়িত্ব। পঞ্চাশ মিনিটের মাথায় সম্মিলিত আক্রমণে ইংল্যাণ্ড সীমানার মধ্যে ধেয়ে গেল আর্জেন্টিনা। ভালদোনার চমৎকার একটি লব বাঁ দিক থেকে উঠে এলো ইংল্যাণ্ড গোল সীমানার মধ্যে। সামনে একমাত্র গোলরক্ষক শিলটন। বল লক্ষ করে মারাদোনা যখন এগিয়ে গেলেন তখন অনেকের ধারণায় তিনি নাকি অফ-সাইড পজিসানে ছিলেন। রেফারি কোনো সংকেত না দেওয়ায় বল লক্ষ করে স্পট-জাম্প দিলেন খুদে মানুষটি। এরপর সবাই দেখতে পেলেন আশ্চর্য তৎপরতায় মারাদোনা বলটি দীর্ঘকায় শিলটনের নাগাল টপকে জালের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই গোলটি নিয়ে পণ্ডিত মহলে বির্তকের শেষ নেই। অফ-সাইডের আবেদন অগ্রাহ্য করা হলেও, গোলটি যে তিনি হাত দিয়ে করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই গোলটি নিয়ে পরে বহু জল ঘোলা হয়েছে। সম্রাট পেলে মারাদোনাকে প্রতারক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর উক্তি নিয়ে আমাদের দেশের কতিপয় কাগজে ফুটবলারেরা এবং সমালোচকেরা তাঁকে পাল্টা কটূক্তি করতে দ্বিধা করেন নি। সম্রাট পেলে সম্পর্কে তাদের এই হাস্যকর বিশ্লেষণ এবং মন্তব্যগুলি যদি কখনও স্বয়ং মারাদোনার দৃষ্টিগোচর হয় এবং তিনি যদি তার পাঠোদ্ধার করতে পারেন, তাহলে হয়তো তিনিও ভারতবর্ষের এই সমস্ত অযোগ্য

ব্যক্তিদের মন্তব্য সম্পর্কে পেলের কাছে তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন। কারণ আন্তর্জাতিক ফুটবলে যে মানুষটি দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁকে কোনো কটূক্তি করার আগে নিজেদের যোগ্যতার বিষয়ে তাদের সচেতন, হওয়া উচিত ছিল না কি ? এশিয়া, মানে ফুটবল খেলার অধিকার যাদের নেই তাদের এত বড় ধৃষ্ঠতা হয় কি করে ? আসলে পেলের কাছে ফুটবল পেশাদার হলেও, তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে একজন খাঁটি খেলোয়াড় যাঁর কাছে গ্রাউণ্ড-ম্যানসীপের চাইতে স্পোর্টস্‌ম্যানসীপ ছিল অনেক বড়ো—অনেক উঁচু আদর্শের। এই আদর্শের স্থলে মনে হয় মারাদোনার পক্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা পেলের সম্মানে কখনোই সম্ভব নয়। যদি তা সহজ হতো, তাহলে পেলের সমকালে আরও কিছু এমন ফুটবলার ছিলেন, যাঁরা কেবলমাত্র ফুটবল প্রতিভার জৌলুসে অনায়াসে পারতেন পেলের মহত্বকে ছাপিয়ে যেতে। আসলে ফুটবল প্রতিভা এবং খেলোয়াড়োচিত আচরণ যা আধুনিক দুনিয়ায় বিরল দৃষ্টান্ত—এই দুয়ের সমন্বয়ে পেলে নিজেকে এতো নিখুঁতভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে আন্তর্জাতিক ফুটবল আসরের পণ্ডিতের দল তাঁকে 'সম্রাটে'র সম্মানে ভূষিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে একটি বড় মাপের আসরে একজন বড় খেলোয়াড়কে অবৈধভাবে হাত দিয়ে গোল করার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টাটাই দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়েছে। এমন অপরাধ তো তাঁর জীবনে নেই—যদি থাকতো তাহলে হয়তো বিশ্বের সেরা লিখিয়েরা তাঁকে বন্দনা না করে ওই 'প্রতারক' শব্দটি তাঁর নামের পাশে ব্যবহার করতেন—তা কি কেউ করেছেন ? এমন অপরাধ তাঁর জীবনে কখনো ঘটেছে বলে বিশ্বের কোনো কলম লিখিয়ের জানা নেই। কাজেই তাঁর মতো একজন মনুষ্যত্ব সর্বস্ব খেলোয়াড়োচিত চরিত্রের মানুষের পক্ষে মারাদোনাকে তাঁর অপরাধের জন্য প্রতারণা শব্দটি ব্যবহার করার অধিকার থাকলেও সম্রাট পেলের সম্পর্কে কটূক্তি করার অধিকার কোনো ফুটবল অযোগ্য ভারতীয় খেলোয়াড় বা সমালোচকদের নেই। কেবলমাত্র দূরদর্শনের কল্যাণে বিশ্বকাপ খেলা দেখার সুযোগ পেয়ে, এমন একটি বিতর্কিত মন্তব্যের মধ্যে নির্লজ্জের মতো নাক গলানো মনে হয় এদেশের কোনো সমালোচকের শোভন হয় নি। এটা একটা ধৃষ্ঠতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

থাক আলোচনা, ফিরে যাই আবার সেই খেলার মধ্যে। মারাদোনার বিতর্কিত গোলে এগিয়ে যাওয়া আর্জেন্টিনা এবার যেন নতুন করে চেপে ধরলো ইংল্যাণ্ড দলটিকে। প্রথম গোলটির বিতর্কের অবসান ঘটাতে নায়ক মারাদোনা একজন শ্রেষ্ঠ ফুটবলারের মডেল হিসাবে দ্বিতীয় গোলটি দলকে উপহার দিলেন। মাঝমাঠ থেকে বল ধরে একক প্রয়াসে সাবলীল ভঙ্গিমায় তিন-চারজন ডিফেনডারকে টপকে গিয়ে সোজা ঢুকে পড়েন ইংল্যাণ্ড গোল সীমানার মধ্যে। সামনেই ছিলেন আগুয়ান গোলরক্ষক শিলটন। মারাদোনা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় আগুয়ান শিলটনকে কাটিয়ে একটি স্বপ্নের গোল করলেন। মারাদোনার এই গোলটিকে শিলটন তাঁর জীবনভোর মনে রাখবেন। মনে হয় এবারের বিশ্বকাপে এটাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ গোল। ২—০ গোলে পিছিয়ে পড়া ইংল্যাণ্ড শেষ মুহূর্তে আক্রমণে ফিরে আসে। তারা খেলায় বাড়তি গতি প্রয়োগ করে ৮১ মিনিটের মাথায় তুলে নেয় একটি গোল। গোলটি করেন লিনেকার। এই গোলের পর লিনেকারের কাছে আবার একটি গোল করার সহজ সুযোগ এসেছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হন। ফলে ২—১ গোলের ব্যবধানে ইংল্যাণ্ডকে পিছনে ফেলে মারাদোনার নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা উঠে যায় সেমি-ফাইনালে।

ভরাডুবি হলো ফ্রান্সের :

ইতালি ও ব্রাজিলকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠে আসা ফ্রান্স সম্পর্কে বিশ্বের বহু মানুষ ছিলেন আশাবাদী। বিশেষভাবে যে ফ্রান্স বর্তমানে ইউরো-পিয়ান চ্যাম্পিয়ান, যে দলে আছেন বিশ্বের সেরা মিড-ফিল্ডার খেলোয়াড়রা, সেই দলকে হারানো জার্মানীর পক্ষে সহজ হবে না একথা সবাই জানতো। আশা ছিল ম্যাচটি হবে উচ্চাঙ্গের। স্বপ্রতিভায় নিজেকে শেষবারের বিশ্ব-কাপে মেলে ধরবেন প্লাতিনি। হায়রে! কার্যত কোনো হিসাবই মিললো না। ফ্রান্সের শিল্প সমৃদ্ধ ফুটবল জার্মানীর গতির কাছে ছত্রাকার হয়ে গেল। যে মিড-ফিল্ড নিয়ে ফ্রান্সের এতো গর্ব, এতো অহংকার, সেই মাঝমাঠ আগাগোড়া দখলে রাখলো জার্মানবাহিনী। গতবার বিশ্বকাপে ফ্রান্স মূলতঃ ভুগেছিল দলে কোনো পজিটিভ স্ট্রাইকার না থাকার জন্য—এবারেও তাদের

সেই সমস্যায় ভুগতে দেখা গেল। 'হাইগু-স্ট্রাইকার' হিসাবে আগাগোড়া ব্যবহার করা হলো প্লাতিনিকে।

এই ম্যাচে প্রথম কুড়ি মিনিট খেলার মধ্যে ফ্রান্সের প্রাধান্য ছিল। দুরন্ত গতিতে না হলেও, তাদের আক্রমণের মধ্যে কোনো ত্রুটি ছিল না। বরং তাদের খেলা দেখে মনে হয়েছিল তারা যেন বিরাশির বিশ্বকাপের বদলা নেওয়ার জন্য এবার প্রস্তুত হয়ে মাঠে নেমেছে। শুরুতে ফ্রান্স-আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন প্লাতিনি। মাঠ ভিজে থাকায় তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক গতি বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। তবু তিনি অন্ততঃ দুটি ক্ষেত্রে নিখুঁত বল বাড়িয়েছিলেন বেলোনির উদ্দেশ্যে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট বেলোনি সেই সুযোগ অপচয় করেন। ফলে এক সময় খেলাটি ধীরে ধীরে চলে যায় জার্মানীদের কবলে। শুরুর মুখে ফ্রান্স যখন আক্রমণে ছিল, ঠিক তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে একটি গোল পেয়ে এগিয়ে যায় জার্মান দল। ৯ মিনিটের মাথায় বক্সের ডানদিকে রুমানিগাকে ট্রিপ করা হলে ফ্রি-কিক পায় জার্মান দল। ফ্রি-কিকে রুমানিগার পুশ থেকে প্রচণ্ড গতিতে বাঁ পায়ে তীব্র শট করে প্রথম জার্মানকে এগিয়ে দিলেন ব্রেহাম। তাঁর বিদ্যুৎগতির শটটি পিছল মাঠে হাতের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি বাট্স। বল তাঁর হাতে লেগে গোলের মধ্যে প্রবেশ করে। গোল খাওয়া ফ্রান্স কিন্তু দমে যায় নি। গোল শোধ করার সংকল্প নিয়ে তারা শুরু করে দিলো একের পর এক আক্রমণ। এর পরেই ফ্রান্সের আক্রমণ শিথিল হয়ে যায়। মাঝ মাঠ দখল করে ফেলেন রুমানিগা। খেলায় ফিরে আসে জার্মান দল।

এর পরেই শুরু হয়ে যায় জার্মানীদের একের পর এক বোমারু আক্রমণ। অন্ততঃ তিনটি ক্ষেত্রে বাট্স নিশ্চিত গোল রক্ষা করলেন। ফ্রান্সের মাঝ মাঠে তিগানা ছাড়া দ্বিতীয় কারো ছায়া লক্ষ করা গেল না। যে প্লাতিনিকে গোটা ফ্রান্সের ভরসা হিসাবে ভাবা হয়েছিল সেই তিনি এই ম্যাচে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। বিরাশির সেমি-ফাইনালের কোনো প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট আছে বলে মনে হলো না। দলের মধ্যে কোনো পজিটিভ স্ট্রাইকার না থাকায় তাঁকে দিয়েই গোল করানোর চেষ্টা করা হলো। শেষ মুহূর্তে প্লাতিনি গোল করার মতো তিন-তিনটি সুযোগ পেয়েও

কাজে লাগাতে পারলেন না। তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি বলকে ট্র্যাপ করতে পারেন নি। তাঁর মতো একজন প্রতিভাবান্ ফুটবলারের এই দৈন্যতা সত্যিই ছিল দৃষ্টিকটু। বোঝা গেল, যে প্লাতিনিকে নির্ভর করে ফ্রান্সের সমর্থকেরা ছিয়াশির বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন, সেই প্লাতিনি বিরাশির ক্যাসেটেই শেষ হয়ে গেছেন—ছিয়াশির আসরে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। শেষ মুহূর্তে ফ্রান্সের দশজন খেলোয়াড় উঠে আসার সুযোগ নিয়ে ফয়লার দ্বিতীয় গোলটি করে গেলেন। ফলে দুই গোলে পিছিয়ে পড়া ফ্রান্সকে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন ভুলতে হলো। ব্যর্থতার শীর্ষে দাঁড়ানো প্লাতিনির ফ্রান্সকে সরে যেতে হলো বিশ্বকাপ আসর থেকে। ফাইনালে উঠে এলো পশ্চিম জার্মানী। তারা আবার নতুন করে প্রমাণ করে দিলো, যুদ্ধ তাদের রক্তে—ফুটবলে জয় তাদের কাম্য।

অন্যদিকে আর একটি সেমি-ফাইনালে বেলজিয়ামকে অতি সহজে বিধ্বস্ত করলো আর্জেন্টিনা। এই দিনেও মারাদোনা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরলেন। তাঁর অপ্রতিরোধ্য গতির সামনে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বেলজিয়াম দলের রক্ষণভাগ। তাঁকে সামাল দিতে রক্ষণভাগের খেলোয়াড় রাভিয়েও পতন রোধ করতে পারলো না বেলজিয়াম দলের। এই ম্যাচেও তিনি একক প্রচেষ্টায় দিলেন দর্শনীয় দুটি গোল। এই দিনে তাঁর দেওয়া দ্বিতীয় গোলটি গত ম্যাচের দেওয়া দ্বিতীয় গোলটির চাইতে কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে আর্জেন্টিনার ব্যবধান আরও বেড়ে যেতো, শুধু তাই নয়, হ্যাটট্রিকও পেয়ে যেতেন মারাদোনা। শেষ দুটি ম্যাচে তাঁর অনবদ্য ভূমিকায় আর্জেন্টিনা উঠে এলো ফাইনালে।

মারাদোনা নয় বুরুচাগা :

২৯শে জুন। রবিবার। আজটেক ষ্টেডিয়ামে মুখোমুখি হলো আর্জেন্টিনা ও পশ্চিম জার্মানী। এই ম্যাচের ফলাফল কি হতে পারে তা নিয়ে গবেষণায় বসলেন বিশেষজ্ঞের দল। বিগত ম্যাচগুলিতে যেভাবে দুটি দল খেলেছে, তা বিশ্লেষণ করলে সম্ভাবনার পাল্লা আর্জেন্টিনার দিকে ঝোঁকে বেশী। তা ছাড়া আর্জেন্টিনা দলে আছেন মারাদোনার মতো এক বিস্ময় প্রতিভা, যিনি

পারেন একার ক্ষমতায় গোটা একটা দলকে টেনে নিয়ে যেতে—অন্ততঃ এবারের বিশ্বকাপের প্রতি ম্যাচেই সে কথা তিনি সদর্পে ঘোষণা করেছেন।

আর্জেন্টিনার পক্ষে রায় দেওয়া সত্ত্বেও, অভিজ্ঞের দল কিন্তু পশ্চিম জার্মানীকে একেবারে উড়িয়ে দিলেন না। তাঁরা বললেন, বিগত ম্যাচগুলিতে মারাদোনা যেভাবে খেলে এসেছেন সেই খেলা তাঁর পক্ষে ফাইনালে খেলা সম্ভব হবে না। কারণ জার্মানীরা লড়িয়ে জাত। তাদের রক্তে আছে যুদ্ধের নেশা। তারা যেমন সাহসী তেমনি পরিশ্রমী। বিনা যুদ্ধে তারা পরাজয়কে মেনে নেবে না। তাছাড়া জার্মানীরা বড় ম্যাচ খেলতে অভ্যস্ত। তারা জানে কেমন করে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রগুলিকে ভোঁতা করে দিতে হয়। কাজেই আশা করা যায় জার্মানীরা এই ম্যাচে গতিবান্ শিল্পী মারাদোনাকে তাদের শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ জানাবে। কাজেই মারাদোনা ইংল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম দলের কাছ থেকে যে ভাবে ম্যাচ বার করে এনেছিলেন, সেইভাবে তাঁর পক্ষে পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে ম্যাচ বার করে আনা সম্ভব হবে না।

আর পশ্চিম জার্মানী? তাদের লক্ষ ছিল মারাদোনা। তারা জানতো যদি কঠিন প্রতিরোধে মারাদোনাকে অকেজো করে ফেলা যায় তাহলে আর্জেন্টিনার পক্ষে আক্রমণে উঠে আসা সম্ভব হবে না। কাজেই সব মিলিয়ে আজটেকের ফুটবল যুদ্ধ জব্বর জমে উঠলো।

ফাইনাল ম্যাচের আগের দিন ফ্রান্স-বেলজিয়ামের লড়াই হয়ে গিয়েছিল। এই ম্যাচে সহজ জয় পেয়েছিল ফ্রান্স। তারা ৪—২ গোলে বেলজিয়ামকে হারিয়ে পেয়ে গেছে তৃতীয় স্থান।

রবিবার আজটেকে মারাদোনার পক্ষেই জয়ধ্বনি ছিল বেশী। এই ম্যাচ তাঁর কাছে একটা মস্ত চ্যালেঞ্জ। দেশবাসীকে তিনি উপহার দিতে চান ফুটবলের সেরা উপহার—ফিফা কাপ!

ব্রাজিলিয়ান রেফারি বাঁশি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে নাটক জমে উঠলো। শুরু থেকেই আক্রমণে মেতে উঠলো আর্জেন্টিনা। তাদের আক্রমণের ধরন দেখে মনে হলো তারা যেন জয়ের সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ম্যাচের প্রথম দিকে বেশ কিছুক্ষণ চললো জমি দখলের লড়াই। বর্ষিয়ান জার্মান খেলোয়াড়েরা

এইদিন শুরু থেকেই মারাদোনাকে সাঁড়াশির চাপে নজরে রাখলো। উদ্দেশ্য, তাঁকে বল দখল করতে না দেওয়া। ফলে মারাদোনা বল ছোঁয়া মাত্র দেখা গেল তিনজন খেলোয়াড় তাঁকে সব সময় ঘিরে ধরেছে। এই জাতীয় প্রতিরোধে সত্যি বলতে কি মারাদোনা অন্য ম্যাচগুলির মতো এই ম্যাচে নিজেকে স্বাভাবিক মেজাজে মেলে ধরতে পারলেন না। তবে তাঁকে অতি মাত্রায় নজর রাখতে গিয়ে জার্মানরা বেশ কিছুটা ফাঁকায় খেলার সুযোগ করে দিলেন ভালদোনা ও বুরুচাগাকে। এই দুর্বলতাই মনে হয় কাল হয়েছিল। মারাদোনার বিকল্পে এই ম্যাচে নিজেকে পুরোপুরি ব্যবহার করার সুযোগ পেলেন বুরুচাগা। এই ম্যাচটিতে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে খেলে বুঝিয়ে দিলেন প্রতিভায় তিনি মারাদোনার চাইতে খুব একটা খাটো নন। সময় তাঁকে পরিণত করলে তিনি ভবিষ্যতে আরও ভয়ানক হয়ে উঠবেন। বলের নিখুঁত দখল রেখে বুরুচাগা একাই মাঝ মাঠ নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছিল একেকটি দুর্ধর্ষ মুভ। ৩২ মিনিটের মাথায় মারাদোনাকে ট্রিপ করলে ফ্রি-কিক্ পায় আর্জেন্টিনা। ডান পায়ে ফ্রি-কিক্ নিলেন বুরুচাগা। তিনি চমৎকারভাবে বলটিকে জার্মান সীমানার মধ্যে লব করে দিলেন। সামনে জটলার মধ্যে বলটি যাতে চলে না যায়, তার জন্য হঠাৎ করেই গোলরক্ষক শুমাখার বলটিকে নিজের আয়ত্বে আনার বাসনায় গোল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিমাই তাঁকে বিপাকে ফেললো। তিনি বলের ফ্লাইট মিস্ করলেন। ফলে শুমাখারের নাগাল টপকে বলটি সোজা এসে পড়লো ওভারল্যাপ করে ওপরে উঠে আসা ব্রাউনের মাথায়। এই গোলটি যেন ব্রাউনকে পুরস্কার দিলেন শুমাখার, নচেৎ তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ গোলরক্ষক এতোবড়ো ভুল করলেন কি করে? তিনি যদি গোল ছেড়ে হঠাৎ করে ওইভাবে বেরিয়ে না আসতেন, তাহলে হলপ করে বলা যায় ওই হেড থেকে গোল পেয়ে আর্জেন্টিনার এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। আসলে ছোটোখাটো দু-একটা ভুলইতো গোলের পথ তৈরী করে—অতএব শুমাখারের ভুলে প্রথম একটি গোল খেয়ে পিছিয়ে গেল জার্মান দল।

গোল খেয়ে জার্মান দল যেন নতুন করে জ্বলে উঠলো। গোল খেয়ে

গোল শোধ করার মতো ক্ষমতা জার্মান বাহিনীর যে আছে, একথা তারা বিগত ফাইনালগুলিতে বহুবার প্রমাণ করেছে—কাজেই ব্রাউনের গোলটি তাদের কাছে মোটেই হতাশাব্যঞ্জক ছিল না। এই সময় রুমানিগা একাই ওপরে উঠে এসে খেলছিলেন, ফলে তাঁর দিক থেকে গোল করার মতো সুযোগ তৈরী করা যথাযথভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বিরতির পর জার্মান কোচ বেকেনবাওয়ার দলের পরিবর্তন করলেন। তিনি খেলাটিকে আক্রমণাত্মক করার উদ্দেশ্যে মাঠে নামালেন ফয়লারকে। খেলার প্রকৃত গতি বদল হলো ভালদোনা দ্বিতীয় গোলটি করে যাওয়ার পর। মনে হয় বেকেনবাওয়ার উপলব্ধি করলেন সময় থাকতে সর্বাত্মক আক্রমণে উঠে যেতে না পারলে জার্মানীকে সমূহ বিপদের মধ্যে পড়তে হবে। সেই কারণে তিনি আবার বদলী হিসাবে মাঠে নামালেন হোয়েনেসকে। এই পরিবর্তনের ফলে জার্মান আক্রমণ অনেকখানি সংগঠিত হলো। আগের তুলনায় অনেক আত্মবিশ্বাসে চলাফেরা করতে শুরু করলেন রুমানিগা। বেকেনবাওয়ারের স্ট্যাটিজি যে ভুল ছিল না তার প্রমাণ মিললো শেষ কুড়ি মিনিটের খেলায়। সমতা ফিরিয়ে আনলো জার্মান দল। দু-দুটি কর্নার থেকে দুটি গোল শোধ করে দিয়ে তারা খেলার উত্তেজনা বাড়িয়ে দিল। প্রথম গোল করলেন অভিজ্ঞ রুমানিগা। তিনি দলের কাছে এখন অপরিহার্য তা বুঝিয়ে দিলেন ঠাণ্ডা মাথায় চকিত স্পর্শে গোলটি দিয়ে। বাঁ দিক থেকে করা কর্নারে প্রথম মাথা ছুঁয়ে দিলেন ফয়লার। তিনি মাথা ছুঁয়ে বলটিকে রুমানিগার উদ্দেশ্যে নির্ভুল ঠিকানায় পাঠানো মাত্র, চোখের পলকে তৎপর রুমানিগা বলটিকে গোলে পাঠান। এই গোলের পরই জার্মানীরা সর্বাত্মক আক্রমণে কোমর বেঁধে লেগে পড়ে। দশ মিনিটের মধ্যে তারা আবার আদায় করে নেয় আর একটি কর্নার। এবার সেই বাঁ দিক থেকে আসা কর্নার শটে মাথা ছুঁয়ে বলটি জালে পাঠান স্বয়ং ফয়লার।

খেলায় সমতা ফিরে আসতেই মনে হয় জার্মানরা একটু বেশী মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। পিছনের দিকে প্রতিরোধের কোনো মজবুত ব্যবস্থা না রেখেই তারা তৃতীয় গোলের প্রত্যাশায় উঠে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা সীমানার মধ্যে। এই সময় সম্মিলিত আক্রমণে তারা যে গোল পেতো না

তা নয়, তবে তাদের একটু সতর্ক থাকা উচিত ছিলো। মারাদোনাকে ফাঁস-বন্দী করলেও সেই দলে যে আরও কয়েকজন উচ্চাঙ্গের ফুটবলার আছেন, মনে হয় এই কথাটি জার্মান খেলোয়াড়েরা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিলো। আর তারই মাশুল হিসাবে মাঝমাঠে ফাঁকায় বল পেয়ে বুরু-চাগা সোজা দৌড় লাগালেন জার্মান সীমানার দিকে। প্রায় চল্লিশ গজের মতো জমি তিনি দৌড়ে পার হলেন কার্ল লুইসের গতিতে। তাঁকে এই সময় পিছন থেকে বাধা দেওয়ার মতো কোনো একজনও জার্মান সৈনিক রক্ষণ-ভাগে অবশিষ্ট ছিলো না। ফলে নিরুপায় গোলরক্ষক শুমাখার নিশ্চিত পতন জেনে শেষ চেষ্টায় বুরুচাগাকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গোল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। ততোক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা মাথায় অরক্ষিত গোলে বল ঠেলে দেওয়ার মতো উপযুক্ত জায়গায় পৌঁছে গিয়ে-ছিলেন বুরুচাগা। বিশ্বকাপ ফাইনালে জয়সূচক গোল করতে পারার মতো সৌভাগ্য তাঁকে গড়ে দেওয়ার জন্য, তিনি বলটি জালে ঠেলে দিয়েই পরম কৃতজ্ঞতায় হাঁটু গেড়ে বসে আকাশের দিকে দু-হাত তুলে প্রণাম জানালেন শক্তিমান পরম পিতার উদ্দেশ্যে !

বুরুচাগার এই গোলের সুবাদে বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ করলো আর্জেন্টিনা। এই নিয়ে তারা দ্বিতীয়বার পেলো এই সম্মান। সেই সঙ্গে আর্জেন্টিনা লাতিন-আমেরিকার সম্মান রক্ষা করলো, ইউরোপীয় গোষ্ঠির সেরা দেশ পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে সম্ভব হলো না লাতিন-আমেরিকা থেকে বিশ্বকাপ জয় করে নিয়ে যাওয়া। ফলে এই জয়ের সুবাদে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের সম্মানে এক ধাপ এগিয়ে গেল লাতিন-আমেরিকা—তারা তেরোবারের মধ্যে এই কাপ জয় করলো সাতবার। ধন্যবাদ পশ্চিম জার্মানীকে—পরাজিত হয়েও বিশ্বের কাছে তারা নিজেদের আর একবার লড়িয়ে জাত হিসাবে প্রমাণ করে দিলো—প্রমাণ করে দিলো ভাঙাচোরা দল নিয়ে একমাত্র জার্মানরাই পারে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখতে।

ছিয়াশির আসর শেষ। সমস্ত উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে খর্বকায় মারাদোনা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন সম্রাটের ভূমিকায়। তিনি হলেন এবারের বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়।

এতো সুখ, এতো আনন্দ, এতো সম্মানের মধ্যেও মনে হয় মারাদোনা নামক খর্বকায় যাদুকরটি তৃপ্ত হতে পারেন নি। আকাঙ্খিত সোনার কাপে হাত রেখে হয়ত তাঁকে বুকচাপা ভাষায় বলতে শোনা যায়—হায় মারাদোনা, তোমার সব স্বপ্নই সফল হয়েছে, কেবল ভাবতে কষ্ট হচ্ছে শেষ দিনটি তোমার ছিল না। এলো না তোমার সোনার পায়ের যাদু স্পর্শে একটিও গোল—এই দিনটার কথা স্মরণ করে তাই হয়তো সকলে বলবে, দিনটা মারাদোনার নয়—বুরুচাগার।

বলা বাহুল্য এবারের বিশ্বকাপে গোল হয়েছে সর্বসাকুল্যে ১৩১টি। সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেয়েছেন ইংল্যাণ্ডের দশ নম্বর খেলোয়াড় লিনেকার—একটি হ্যাটট্রিকসহ দিয়েছেন ৬টি গোল। মাত্র একটি গোলের ব্যবধানে পিছিয়ে গেলেন মারাদোনা—তাই শেষ দিনে গোল দিতে না পারার জন্যই এতো আক্ষেপ।

১৯৯০ সালে আবার বিশ্বকাপ আসর অনুষ্ঠিত হবে। এবার আসর বসবে ইতালিতে। সেই আসরে কে চ্যাম্পিয়ান হবে তাই নিয়ে নতুন করে শুরু হবে প্রস্তুতির পর্ব। আগামী দিনের সেই আসরে এবারের নায়ক মারাদোনা কি পারবেন নিজেকে স্বমূর্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে? নাকি ভবিষ্যতের পাতায় উঠে আসবেন অন্য কোনো নায়ক—তিনি, বুরুচাগা, ভালদোনা, লিনেকার, লাউড্রপ, কারেকা, জেসিমার—নাকি অন্য কোনো নায়ক।

বিশ্বকাপ আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতা
(১৯৩০-১৯৮৬)

সাল	নাম	দেশ	গোল
১৯৩০	স্টাবিল	আর্জেন্টিনা	৮টি
১৯৩৪	নেজেদলি	চেকোশ্লাভিয়া	৪টি
,,	শিয়াভিও	ইতালি	৪টি
,,	কনেন	জার্মান	৪টি
১৯৩৮	লিওনিডাস	ব্রাজিল	৮টি
১৯৫০	আমেদির মেনেজেস	ব্রাজিল	৭টি
১৯৫৪	কোজিস	হাঙ্গেরী	১১টি
১৯৫৮	ফনটাইন	ফ্রান্স	১৩টি
১৯৬২	আলবার্ট	হাঙ্গেরী	৪টি
,,	গ্যারিঞ্চা	ব্রাজিল	৪টি
,,	ভাভা	ব্রাজিল	৪টি
,,	জারকোভিক	যুগোশ্লাভ	৪টি
,,	ইভানভ	রাশিয়া	৪টি
,,	এলসানচেজ	চিলি	৪টি
১৯৬৬	ইউসোবিও	পর্তুগাল	৯টি
১৯৭০	গার্ড মুলার	পঃ জার্মানী	১০টি
১৯৭৪	লাটো	পোল্যাণ্ড	৭টি
১৯৭৮	মারিও ক্যাম্পেস	আর্জেন্টিনা	৬টি
১৯৮২	পাওলা রোসি	ইতালি	৬টি
১৯৮৬	লিনেকার	ইংল্যাণ্ড	৬টি

বিশ্বকাপ আসরে কে কোথায় চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স

(১৯৩০-১৯৮৬)

সাল	স্থান	চ্যাম্পিয়ান	রানার্স	ফলাফল
১৯৩০	উরুগুয়ে	উরুগুয়ে	আর্জেন্টিনা	৪—২
১৯৩৪	ইতালি	ইতালি	চেকোশ্লাভিয়া	২—১
১৯৩৮	ফ্রান্স	ইতালি	হাঙ্গেরী	৪—২

(১৯৩৯-৪৯ সাল পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিশ্বকাপ আসর বন্ধ ছিল)

*১৯৫০	ব্রাজিল	উরুগুয়ে	ব্রাজিল	
১৯৫৪	সুইজারল্যাণ্ড	পঃ জার্মানী	হাঙ্গেরী	৩—২
১৯৫৮	সুইডেন	ব্রাজিল	সুইডেন	৫—২
১৯৬২	চিলি	ব্রাজিল	চেকোশ্লাভিয়া	৩—১
১৯৬৬	ইংল্যাণ্ড	ইংল্যাণ্ড	পঃ জার্মানী	৪—২
১৯৭০	মেক্সিকো	ব্রাজিল	ইতালি	৪—১
১৯৭৪	পঃ জার্মানী	পঃ জার্মানী	হল্যাণ্ড	২—১
১৯৭৮	আর্জেন্টিনা	আর্জেন্টিনা	হল্যাণ্ড	৩—১
১৯৮২	স্পেন	ইতালি	পঃ জার্মানী	৩—১
১৯৮৬	মেক্সিকো	আর্জেন্টিনা	পঃ জার্মানী	৩—২

* ১৯৫০ সালে লীগ ভিত্তিতে খেলার ফলাফল নির্ধারিত হয়।

বিশ্বকাপ আসরে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান যারা পেয়েছে

(১৯৩৪-১৯৮৬)

সাল	স্থান	৩য়	৪র্থ	ফলাফল
১৯৩৪	ইতালি	জার্মানী	অস্ট্রিয়া	৩—২
১৯৩৮	ফ্রান্স	ব্রাজিল	হাঙ্গেরী	৪—২
(১৯৩৯-৪৯ সাল পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিশ্বকাপ আসর বন্ধ ছিল।)				
* ১৯৫০	ব্রাজিল	সুইডেন	স্পেন	
১৯৫৪	সুইজারল্যাণ্ড	অস্ট্রিয়া	উরুগুয়ে	৩—১
১৯৫৮	সুইডেন	ফ্রান্স	পঃ জার্মানী	৬—৩
১৯৬২	চিলি	চিলি	যুগোশ্লাভ	১—০
১৯৬৬	ইংল্যাণ্ড	পর্তুগাল	রাশিয়া	২—১
১৯৭০	মেক্সিকো	পঃ জার্মানী	উরুগুয়ে	১—০
১৯৭৪	পঃ জার্মানী	পোল্যাণ্ড	ব্রাজিল	১—০
১৯৭৮	আর্জেন্টিনা	ব্রাজিল	ইতালি	২—১
১৯৮২	স্পেন	পোল্যাণ্ড	ফ্রান্স	৩—১
১৯৮৬	মেক্সিকো	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	৪—২

* ১৯৫০ সালে লীগভিত্তিতে খেলার ফলাফল নির্ধারিত হয়।

বিশ্বকাপ আসরে গোল সংখ্যা ও গড়

(১৯৩০-১৯৮৬)

সাল	খেলা	গোল	ম্যাচ প্রতি গড়
১৯৩০	১৮	৭০	৩.৮৮
১৯৩৪	১৭	৭০	৪.১১
১৯৩৮	১৮	৮৪	৪.৬৬
১৯৫০	২২	৮৮	৪.০০
* ১৯৫৪	২৬	১৪০	৫.৩৮
১৯৫৮	৩৫	১২৬	৩.৬০
১৯৬২	৩২	৮৯	২.৭৮
১৯৬৬	৩২	৮৯	২.৭৮
১৯৭০	৩২	৯৫	২.৯৬
১৯৭৪	৩৮	৯৭	২.৫৫
১৯৭৮	৩৮	১০২	২.৮৮
** ১৯৮২	৫২	১৪৬	২.৮১
*** ১৯৮৬	৫২	১৩২	২.৫৩

* বিশ্বকাপ ইতিহাসে গড়ে সর্বোচ্চ গোল।

** বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোল।

*** বিশ্বকাপ ইতিহাসে গড়ে সর্বনিম্ন গোল।

বিশ্বকাপ আসরে সফল অধিনায়ক

(১৯৩০-১৯৮৬)

সাল	নাম	দেশ
১৯৩০	নাসাজি	উরুগুয়ে
১৯৩৪	কম্বি	ইতালি
১৯৩৮	মিজ্জা	ইতালি
১৯৫০	ভারেলা	উরুগুয়ে
১৯৫৪	ওয়ালটার	পঃ জার্মানী
১৯৫৮	বেলিনি	ব্রাজিল
১৯৬২	মাউরো	ব্রাজিল
১৯৬৬	ববিমুর	ইংল্যাণ্ড
১৯৭০	আলবার্টো	ব্রাজিল
১৯৭৪	বেকেনবাওয়ার	পঃ জার্মানী
১৯৭৮	পাসারেলা	আর্জেন্টিনা
১৯৮২	দিনোজফ	ইতালি
১৯৮৬	দিয়াগো মারাদোনা	আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপ আসরে দর্শক উপস্থিতি

(১৯৩০-১৯৮৬)

সাল	খেলা	দর্শক উপস্থিত	ম্যাচ প্রতি গড়
১৯৩০	১৮	৪,৩৪,৫০০	২৪·১৩৯
* ১৯৩৪	১৭	৩,৯৫,০০০	২৩·২৩৫
১৯৩৮	১৮	৪,৮৩,০০০	২৬·৮৩৩
** ১৯৫০	২২	১৩,৩৭,০০০	৬০·৭৭২
১৯৫৪	২৬	৯,৪৩,০০০	৩৬·২৭০
১৯৫৮	৩৫	৮,৬৮,০০০	২৪·৮০০
১৯৬২	৩২	৭,৭৬,০০০	২৮·২৫০
১৯৬৬	৩২	১৬,১৪,৬৭৭	৫০·৪৫৮
১৯৭০	৩২	১৬,৭৩,৯৭৫	৫২·৩১২
১৯৭৪	৩৮	১৭,৭৪,০২২	৪৬·৬৮৫
১৯৭৮	৩৮	১৬,১০,২১৫	৪২·৩৭৪
১৯৮২	৫২	১৭,৬৬,২৭৭	৩৩·৯৬৭
*** ১৯৮৬	৫২	২৪,০৬,৫১১	৪৭·৪৩২

* বিশ্বকাপে গড়ে সর্বনিম্ন দর্শক উপস্থিতি।

** বিশ্বকাপে গড়ে ম্যাচ প্রতি সর্বোচ্চ দর্শক উপস্থিতি।

*** বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ দর্শক উপস্থিতি।

বিশ্বকাপ আসরে বিশ্বের সেরা দশটি দলের সার্বিক ফলাফল

(১৯৩০-১৯৮৬)

দেশ	চূড়ান্ত পর্ব	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
ব্রাজিল	১৩	৩	১	২	১
পশ্চিম জার্মানী	১১	২	৩	২	১
ইতালি	১১	৩	১	×	১
উরুগুয়ে	৯	২	×	×	২
হাঙ্গেরী	৯	×	২	×	১
আর্জেন্টিনা	৯	২	১	×	×
যুগোশ্লাভিয়া	৮	×	×	×	১
চেকোশ্লাভিয়া	৭	×	২	×	×
ফ্রান্স	৯	×	×	২	১
ইংল্যাণ্ড	৮	১	×	×	×

বিশ্বকাপের কিছু জিজ্ঞাস্য (১৯৮৬ পর্যন্ত)

* ১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে প্রথম বিশ্বকাপ শুরু হয়। ফাইনালে খেলে উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা। ফলাফল ছিল ৪-২। উরুগুয়ে জয়লাভ করে।

* ফুটবলে বিশ্বকাপের প্রথম নাম ছিল 'জুলেরিমে'। এই কাপ ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। ১৯৭০ সালে ব্রাজিল ইতালিকে হারিয়ে চিরকালের জন্য এই কাপ জয় করে নিয়ে যায়। সেই শেষ হয় জুলেরিমে কাপের অধ্যায়।

* ব্রাজিল তিনবার বিশ্বকাপ (জুলেরিমে) জয় করে। যথাক্রমে ১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০ সালে। তারা ১৯৭৪ সালে ফিফা কাপ তৈরী হওয়ার পর একবারও জয় করতে পারে নি।

* ইতালি তিনবার বিশ্বকাপ পেয়েছে। এই তিনবারের মধ্যে তারা ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে পেয়েছে জুলেরিমে ও একবার ১৯৮২ সালে ফিফা কাপ পেয়েছে।

* ১৯৭৪ সালে ফিফা কাপের প্রথম আসর মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়।

* ফিফা কাপ: পুরো সোনা দিয়ে তৈরী। ওজন ৬ কেজি। উচ্চতা ৩৬ সে. মি.। মূল্য ৮ হাজার পাউণ্ড।

* বিশ্বকাপ মোট তেরোবার অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ইউরোপে সাতবার এবং ল্যাটিন-আমেরিকায় ছয়বার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

* বিশ্বকাপের তেরোবারের আসরে (১৯৩০-১৯৮৬) ইউরোপ গোষ্ঠী এই কাপ জয় করেছে ছয়বার যথাক্রমে ১৯৩৪, ৩৮, ৫৪, ৬৬, ৭৪ ও ৮২ এবং ল্যাটিন-আমেরিকা গোষ্ঠী সাতবার যথাক্রমে ১৯৩০, ৫০, ৫৮, ৬২, ৭০, ৭৮ ও ৮৬ সালে।

* ল্যাটিন-আমেরিকায় বিশ্বকাপ ছয়বার অনুষ্ঠিত হয় এবং এই ছয়বারই ল্যাটিন-আমেরিকার দেশ এই ট্রফি জয় করে। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ইউরোপের কোনো দেশ ল্যাটিন-আমেরিকা থেকে এই কাপ জয় করে নিয়ে যেতে পারে নি।

* ইউরোপে বিশ্বকাপ সাতবার অনুষ্ঠিত হয়। এই সাতবারে ইউরোপ গোষ্ঠীভুক্ত দেশ এই কাপ জয় করে ছয়বার এবং একবার ১৯৫৮ সালে ব্রাজিল (ল্যাটিন-আমেরিকা) এই কাপ জয় করে।

* বিশ্বকাপ তিনবার জয় করেছে দুটি দেশ, যথাক্রমে—ইতালি ও ব্রাজিল। ইতালি (১৯৩৪, ৩৮ ও ৮২), ব্রাজিল (১৯৫৮, ৬২ ও ৭০)। দুবার করে বিশ্বকাপ পেয়েছে উরুগুয়ে (১৯৩০ ও ৫০), আর্জেন্টিনা (১৯৭৮ ও ৮৬) এবং পশ্চিম জার্মানী (১৯৫৪ ও ৭৪), একবার বিশ্বকাপ পেয়েছে ইংল্যাণ্ড ১৯৬৬ সালে।

* মেক্সিকো পৃথিবীর প্রথম দেশ যেখানে দুবার বিশ্বকাপ আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে যথাক্রমে—১৯৭০ ও ১৯৮৬ সালে।

* বিশ্বকাপে প্রথম কিক-অফ করে ফ্রান্স ১৯৩০ সালে। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় ১৩ই জুলাই মেক্সিকোর সঙ্গে মন্টিভিডিওতে।

* বিশ্বকাপ আসরে সর্বপ্রথম গোলটি করেন ফ্রান্সের লুই লরেন্ট। ১৯৩০ সালে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে মন্টিভিডিওতে ১৩ই জুলাই তারিখে।

* বিশ্বকাপ আসরে শততম গোলটি করেন জোনাসন (সুইডেন) ১৯৩৪ সালে। পাঁচশত গোলটি করেন পশ্চিম জার্মানীর রাণ এবং সহস্রতম গোলটি করেন হল্যাণ্ডের রেনবেনব্রিঙ্ক।

* বিশ্বকাপ আসরে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন বেলজিয়াম দলের স্ট্রাইকার ফ্লোরেন্স।

* বিশ্বফুটবলে একটি ম্যাচে প্রথম চারটি গোল করেন আয়ারল্যাণ্ড দলের প্যাতি মুর। ১৯৩৪ সালে বেলজিয়াম দলের বিরুদ্ধে ডাবলিনে। ফলাফল ছিল ৪—৪।

* বিশ্বকাপ আসরে একটি ম্যাচে উভয় দলের একজন করে খেলোয়াড় চারটি করে গোল দিয়েছিলেন ১৯৩৮ সালে। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় ব্রাজিল বনাম পোল্যাণ্ড দলের মধ্যে। ব্রাজিলের হয়ে চারটি গোল করেন লিওনিডাস দ্য সিলভা এবং পোল্যাণ্ডের হয়ে এমেস্ট উইলিয়েমোস্কি। এই ম্যাচে ব্রাজিল ৬—৪ গোলে জয়লাভ করে।

* বিশ্বকাপ আসরে একটি ম্যাচে সর্বপ্রথম চারটি গোল করেন সুইডেনের গুস্তাফ ওয়েটার স্টোরেন। কিউবা দলের বিরুদ্ধে ১৯৩৮ সালে তিনি এই নজির গড়েন।

* ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বিশ্বকাপ আসরে একটি ম্যাচে চারটি গোল করেছেন ৯ জন ফুটবলার। এই ৯ জন হলেন যথাক্রমে—গুস্তাফ ওয়েটার ষ্টোয়েন (সুইডেন), লিওনিডাস ড্য সিলভা (ব্রাজিল), উইলিয়ামোস্কি (পোল্যাণ্ড), আমেদিরা (ব্রাজিল), ককেসিস (হাঙ্গেরী), ফনটাইন (ফ্রান্স), ইউসোবিও (পর্তুগাল), বুত্রাগুয়েনো (স্পেন), জুয়ান স্কাফিনো (উরুগুয়ে)।

* বিশ্বকাপ আসরে সর্বপ্রথম (মূলপর্বে) পেনাল্টি মিস করেন ব্রাজিলের ড্য ব্রিটো। তিনি ১৯৩৪ সালে স্পেনের বিরুদ্ধে এই নজির গড়েন।

* বিশ্বকাপ আসরে দ্রুততম গোল করেছেন ইংল্যাণ্ডের ব্রায়ান রবসন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ১৯৮২ সালে, ২৭ সেকেণ্ডে।

* বিশ্বকাপ আসরে এক মিনিটের মধ্যে গোল করেছেন—১৯৩৮ সালে সুইডেনের ওলে নাইবার্গ হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে ৩০ সেঃ; ফ্রান্সের বার্নার্ড ল্যাকোম্বে ইতালির বিরুদ্ধে ১৯৭৮ সালে ৩১ সেঃ; এমিলিও বুত্রাগুয়েনো (স্পেন) ৫৬ সেঃ গোল করেন আয়ারল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে ১৯৮৬ সালে। ব্রায়ান রবসন (ইংল্যাণ্ড) ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ১৯৮২ সালে ২৭ সেঃ।

* একটি বিশ্বকাপ আসরে সর্বোচ্চ গোল দিয়েছেন ফ্রান্সের জুস্ট ফনটাইন (জঁ ফঁতে)। ৬টি ম্যাচে তিনি ১৩টি গোল দিয়েছেন ১৯৫৮ সালে।

* একটি বিশ্বকাপ আসরে মূলপর্বের সবকটি ম্যাচে গোল করেছেন মাত্র দুজন ফুটবলার। প্রথম নজির গড়েন ১৯৫৮ সালে ফ্রান্সের ফনটাইন। তিনি ৬টি ম্যাচে ১৩টি গোল করেন। দ্বিতীয় জন হলেন ব্রাজিলের জেয়ারজিনহো। তিনি ১৯৭০ সালে ৬টি ম্যাচে ৭টি গোল করেছিলেন।

* ব্রাজিলের ভাভা হলেন বিশ্ব ফুটবলের একমাত্র ফুটবলার, যিনি পরপর দুটি বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলে, দুটিতেই গোল করেছিলেন। প্রথম গোল করেন ১৯৫৮ সালের ফাইনালে সুইডেনের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় গোল করেন ১৯৬২ সালের ফাইনালে চেকোশ্লোভিয়া দলের বিরুদ্ধে। ভাভা ১৯৫৮ সালের ফাইনালে ১টি ও ১৯৬২ সালের ফাইনালে ২টি গোল করেছিলেন।

* জিওফ হার্স্ট (ইংল্যাণ্ড) হলেন বিশ্ব ফুটবলের একমাত্র ফুটবলার যিনি বিশ্বকাপ ফাইনালে হ্যাটট্রিক করেছেন। তিনি ১৯৬৬ সালে এই নজির গড়েন পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে।

* বিশ্বকাপ আসরে পশ্চিম জার্মানীর উয়েসিলার এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলেছেন। তিনি চূড়ান্ত পর্বে চারটি বিশ্বকাপে (১৯৫৮, ৬২, ৬৬, ৭০) অংশ নিয়ে খেলেছেন ২১টি ম্যাচ।

* বিশ্বকাপ আসরে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোল করেছেন পশ্চিম জার্মানীর গার্ড মুলার। তিনি ২টি বিশ্বকাপ খেলে ১৪টি গোল দিয়েছেন। ১৯৭০ সালে ১০টি ও ১৯৭৪ সালে ৪টি গোল দিয়েছেন।
* অ্যান্তনিও কারবাজাল (মেক্সিকো) বিশ্বের একমাত্র ফুটবলার (গোলরক্ষক) যিনি পাঁচটি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে ১১টি ম্যাচ খেলেছেন। তিনি বিশ্বকাপ খেলেছেন ১৯৫০, ৫৪, ৫৮, ৬২ ও ৬৬ সালে।
* ডেনমার্কের অধিনায়ক মর্টন ওলসেন ১৯৮৬ সালে প্রথম বিশ্বকাপ আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন সর্বোচ্চ ৩৭ বছর বয়সে। আগে এই রেকর্ড ছিল স্যার স্ট্যানলী ম্যাথিযুজের। তিনি ৩৫ বছর বয়সে প্রথম বিশ্বকাপ খেলেছিলেন।
* কম বয়সে সর্বপ্রথম বিশ্বকাপ খেলেছিলেন ব্রাজিলের পেলে, ১৭ বছর ২ মাস বয়সে ১৯৫৮ সালে। পরে এই রেকর্ড ভাঙ্গেন নর্দার আয়ারল্যাণ্ড দলের নরম্যান হোয়াইট। তিনি ১৯৮২ সালে ১৭ বছর বয়সে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।
* সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার হিসাবে বিশ্বকাপ জয়ী দলের পদক পেয়েছেন ১৯৮২ সালে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান ইতালি দলের গোলরক্ষক ও অধিনায়ক দিনোজফ। তিনি ৪০ বছর বয়সে ফাইনাল খেলেন।
* বিশ্বের একমাত্র ফুটবলার নর্দার আয়ারল্যাণ্ড দলের গোলরক্ষক প্যাট জেনিংস, তিনি সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ১১৯টি।
* পেলে বিশ্বের একমাত্র ফুটবলার যিনি চারটি বিশ্বকাপের ফাইনাল রাউণ্ডে গোল করেছেন। চারটি বিশ্বকাপে তাঁর গোলের সংখ্যা মোট ১২টি। ১৯৫৮ সালে ৬টি, ১৯৬২ সালে ১টি, ১৯৬৬ সালে ১টি ও ১৯৭০ সালে ৪টি গোল করেছিলেন।
* পেলে চারটি বিশ্বকাপে ১৪টি ম্যাচ খেলেছেন, যথাক্রমে—১৯৫৮ সালে ৪টি, ১৯৬২ সালে ২টি, ১৯৬৬ সালে ২টি ও ১৯৭০ সালে ৬টি ম্যাচ খেলেছেন।
* বিশ্বকাপের মূলপর্বের খেলায় বিশ্বের একমাত্র গোলরক্ষক পশ্চিম জার্মানীর শেপ মেয়র, যিনি নিজের দুর্গ ৪৭৫ মিনিট ধরে অটুট রেখেছিলেন। এই নজির তিনি গড়েছিলেন ১৯৭৪ সালের ফাইনালে। তাঁর বিরুদ্ধে হল্যাণ্ড দল প্রথম গোলটি করার পর তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ আসরে আবার গোল হয় হল্যাণ্ড দলের সঙ্গে খেলায়। এই মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো গোল হয় নি।
* বিশ্বকাপ আসরে (মূলপর্বে নয়) বাছাই পর্বের খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের গোলরক্ষক রিচার্ড উইলসন একটানা ১৫টি ম্যাচে কোনো গোল খান নি। তিনি মোট ১৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট অক্ষত অবস্থায় ছিলেন।

* বিশ্বফুটবলে পেলে একমাত্র ফুটবলার যিনি তিনবার বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন। ব্রাজিল দলের হয়ে তিনি বিশ্বকাপ জয়ী দলে ছিলেন ১৯৫৮, ৬৬ ও ৭০ সালে।

* বিশ্বকাপ আসরের মূলপর্বে সর্বোচ্চ গোল হয়েছে ১৯৮২ সালে স্পেনে। ৫২টি ম্যাচে ১৪৬টি গোল। ম্যাচ প্রতি গোলের গড় ছিল ২.৮১।

* বিশ্বকাপ আসরে গড়ে কম গোলের রেকর্ড হয়েছে ১৯৮৬ সালে মেক্সিকো আসরে। ৫২টি ম্যাচে ১৩২টি। ম্যাচ প্রতি গোলের গড় ২.৫৩।

* ১৯৮৬ সালে বিশ্বকাপ শেষে মোট গোলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২৮টি গোল।

* বিশ্বকাপ ইতিহাসে গড় গোলের রেকর্ড হয়েছে ১৯৫৪ সালে। সেবার মূলপর্বে মোট ২৬টি ম্যাচে গোল হয় ১৪০টি। ম্যাচ প্রতি গোলের গড় ছিল ৫.৩৮।

* একটি দল হিসাবে বিশ্বকাপের মূলপর্বে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোল দেওয়ার নজির গড়েছে পশ্চিম জার্মানী। তারা ১৯৫৪ সালে ৬টি ম্যাচে ২৫টি গোল করে।

* বিশ্বকাপ আসরের মূলপর্বের একটি ম্যাচে সর্বোচ্চ গোল হয়েছে এগারোটি। এই নজির গড়ে ১৯৮২ সালে। এই ম্যাচে হাঙ্গেরী ১০—১ গোলে হারায় সালভাদর দলকে। ১৯৮৬ সালে বেলজিয়াম স্পেনকে হারায় ৬—৫ গোলে।

* বিশ্বকাপের একটি প্রারম্ভিক ম্যাচে সর্বোচ্চ গোল হয়েছে ১৩টি। নিউজিল্যাণ্ড বনাম ফিজি দলের খেলায় ১৯৮১ সালে। এই ম্যাচে নিউ-জিল্যাণ্ড অকল্যাণ্ডে ফিজিকে হারায় ১৩—০ গোলে।

* বিশ্বকাপ আসরের মূলপর্বে সর্বপ্রথম অমীমাংসিত ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালে অষ্ট্রিয়া বনাম ফ্রান্সের মধ্যে।

* বিশ্বকাপ আসরে সর্বোচ্চ দর্শক হয়েছে ১৯৮৬ সালে মেক্সিকোতে। ৫২টি ম্যাচে ২৪ লক্ষ ৬ হাজার ৫১১ জন দর্শক। ম্যাচ প্রতি খেলা দেখার হিসাব হলো ৪৭ হাজার ৪৩২ জন।

* বিশ্বকাপ আসরে ম্যাচ প্রতি গড় দর্শকের রেকর্ড হয়েছে ১৯৫০ সালে ব্রাজিলে। সেবার ২২টি ম্যাচে দর্শক হয়েছিল ১৩,৩৭,০০০ জন। গড় ছিল ম্যাচ প্রতি ৬০,৭৭২ জন।

* বিশ্বকাপে অনুষ্ঠিত ম্যাচগুলি দূরদর্শনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১৬০টি দেশ দেখেছে ১৯৮৬ সালে মেক্সিকো আসরে।

* বিশ্বকাপ আসরে পেনাল্টিতে সর্বপ্রথম গোল করেন ইতালির ইয়ায়াবোরো।
* বিশ্বকাপ আসরে সর্বপ্রথম আত্মঘাতী গোল করেন সুইজারল্যাণ্ড দলের লোয়েবার।
* বিশ্বকাপ আসরে সর্বপ্রথম মাঠ থেকে বহিস্কৃত হন পেরুর অধিনায়ক ডিলা ক্যাসিয়াস।
* বিশ্বকাপ আসরে অতি দ্রুত রেড কার্ড দেখে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হন উরুগুয়ে দলের জোস বতিস্তা। তিনি ৪৫ সেকেণ্ডের মাথায় মাঠ ছাড়েন ফরাসী রেফারী জোয়েল কুইনিও-র নির্দেশে ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে। এটি একটি রেকর্ড।
* একটি বিশ্বকাপ আসরের মূলপর্বে সর্বোচ্চ বার রেড কার্ড ও ইয়োলো কার্ড দেখার ব্যাপারে রেকর্ড হয়েছে ১৯৮৬ সালে। ১৯৮৬ সালে ৫২টি ম্যাচে রেড কার্ড দেখেছেন ৮ জন এবং ইয়োলো কার্ডে সতর্কিত হয়েছেন ১৩৫ জন। ১৯৮২ সালে রেড কার্ড দেখেছিলেন ৫ জন ও ১০০ জন সতর্ক হয়েছিলেন।
* বিশ্বকাপ আসরে প্রথম রিপ্লে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালে ইতালি বনাম স্পেনের মধ্যে।
* বিশ্বকাপ আসরের ফাইনালে সর্বোচ্চ বার খেলা পরিচালনা করেছেন ইংল্যাণ্ডের রেফারি। তিনবার—১৯৫০, ৫৪, ৬৬ সালে।
* বিশ্বকাপ আসরের মূলপর্বের খেলার মীমাংসার জন্ত অতিরিক্ত সময় খেলানো হয়েছে সর্বোচ্চ ৬টি খেলায়। ১৯৩৮ সালে এই ঘটনা ঘটে। ১৯৮৬ সালে ৫টি খেলায় অতিরিক্ত সময় খেলানো হয়েছে।
* বিশ্বকাপ আসরে সর্বপ্রথম একটি ম্যাচ টাই-ব্রেকারে নিষ্পত্তি হয় ১৯৮২ সালে স্পেনের আসরে। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম জার্মানী বনাম ফ্রান্সের মধ্যে সেমি-ফাইনালে।
* বিশ্বকাপ আসরে কোয়ার্টার ফাইনালের চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটি ম্যাচ টাই-ব্রেকারে নিষ্পত্তি হয় ১৯৮৬ সালে। এটি একটি রেকর্ড। ম্যাচ তিনটি হলো ফ্রান্স বনাম ব্রাজিল, বেলজিয়াম বনাম স্পেন, পশ্চিম জার্মানী বনাম মেক্সিকো দলের মধ্যে।
* বিশ্বকাপ আসর ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মোট তেরোবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই তেরোবারের মধ্যে ব্রাজিল একমাত্র দেশ যারা তেরোবারই মূলপর্বে অংশ নিয়েছে।
* বিশ্বকাপ আসরে একমাত্র দেশ পশ্চিম জার্মানী যারা সর্বোচ্চ পাঁচবার ফাইনাল খেলেছে যথাক্রমে—১৯৫৪, ১৯৬৬, ১৯৭৪, ১৯৮২, ১৯৮৬ সালে।

* ফুটবলার ও দলের ম্যানেজার হিসাবে বিশ্বের একমাত্র ব্যক্তিত্ব মারিও জাগালো বিশ্বকাপ জয়ী দলের পদক পেয়েছেন। জাগালো বিশ্বকাপ বিজয়ী ব্রাজিল দলের সদস্য ছিলেন ১৯৫৮ ও ৬২ সালে। কোচ হিসাবে ছিলেন ১৯৭০ সালে বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দলের সঙ্গে।

* বিশ্বকাপ আসরে সর্বপ্রথম দুই ভাই একত্রে একটি দলে খেলেছেন ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো দলের হয়ে। আর্জেন্টিনা ভ্রাতৃযুগল হলেন ফার্নাণ্ডেজ রোমাস ও ম্যানুয়েল রোমাস এবং মেক্সিকো দলের ভ্রাতৃযুগল হলেন জুয়ান এভারিসটোস ও ম্গিুয়েল এভারিসটোস।

* তেরোবার অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ আসরের মাত্র তিনবারের ফাইনাল অতিরিক্ত সময় খেলা হয়েছে। প্রথম ১৯৩৪ সালে ইতালি বনাম চেকোশ্লাভিয়ার মধ্যে, দ্বিতীয় ১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ড বনাম পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে এবং তৃতীয় ১৯৭৮ সালে আর্জেন্টিনা বনাম হল্যাণ্ডের মধ্যে ফাইনাল ম্যাচটি।

* চারটি বা ততোধিক বিশ্বকাপ খেলেছেন মাত্র চারজন। যথাক্রমে—মেক্সিকোর গোলরক্ষক কাবরাজাল পাঁচবার (১৯৫০-৬৬), পেলে চারবার (১৯৫৮-৭০), উয়ে সিলার (পঃ জার্মানী) চারবার (১৯৫৮-৭০), ববি চার্লটন (ইংল্যাণ্ড) চারবার (১৯৫৮-৭০)।

* বিশ্বকাপ আসরে দশটির বেশী গোল করেছেন যথাক্রমে—গার্ড মুলার (পঃ জার্মানী) দুটি বিশ্বকাপে (১৯৭০-৭৪) ১৪টি, ফ্রান্সের ফনটাইন একটি বিশ্বকাপে (১৯৫৮) ১৩টি, পেলে (ব্রাজিল) চারটি বিশ্বকাপে (১৯৫৮-৭০) ১২টি, হাঙ্গেরীর স্যানডর কোজিস ১৯৫৪ সালে ১১টি ও পশ্চিম জার্মানীর হেলমুট রেইন দুটি বিশ্বকাপে (১৯৫৪-৫৮) ১০টি গোল করেছেন।

* বিশ্বকাপ আসরে ৯টি গোল করেছেন ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আমেদির (ব্রাজিল) ১৯৫০ সালে, ব্রাজিলের ভাভা দুটি বিশ্বকাপে (১৯৫৮ ও ৬২), উয়েসিলার (পশ্চিম জার্মানী) চারটি বিশ্বকাপে (১৯৫৮-৭০), পর্তুগালের ইউসোবিও ১৯৬৬ সালে, ব্রাজিলের জিয়ারজিনো দুটি বিশ্বকাপে (১৯৭০-৭৪), ইতালির পাওলা রোসি তিনটি বিশ্বকাপে (১৯৭৮, ৮২, ৮৬) ও পশ্চিম জার্মানীর রুমানিগা তিনটি বিশ্বকাপে যথাক্রমে—১৯৭৮, ৮২ ও ৮৬ সালে।

———